যৌতুক সিরিজ

শঙ্কর বাঈ



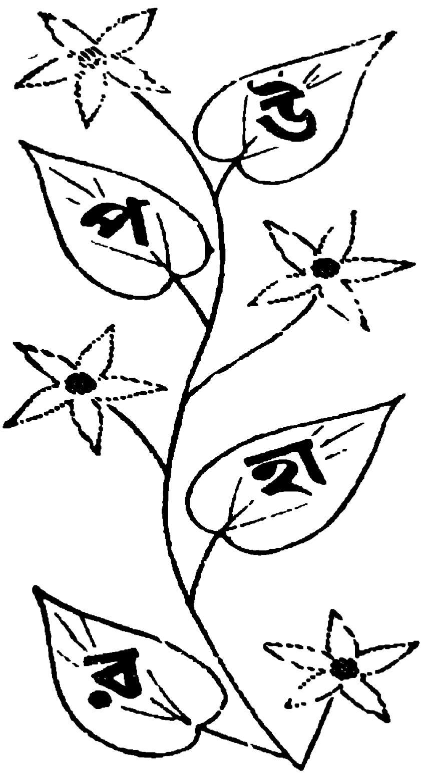
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মার্চ
১৯৫১

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯


উ
প
হা
র

শঙ্করবাঈ

"দুনিয়া খুদাতায়লার, এ দুনিয়া পয়দা হয়েছে তাঁরই হুকুমতে তাঁরই ইচ্ছায়। দিন দুনিয়ার মালিক তিনি। শয়তানও তাঁরই পয়দা তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু শয়তান দুনিয়ার মানুষের উপর খোদার মালিকানি ঘুচিয়ে দিয়ে নিজে মালিক হতে চায়। সেইজন্যে সে মানুষের আত্মাকে কেনে। বাবুসাহেব, আগের কালে গুলাম বিক্রী হত। বান্দা-বান্দী নিয়ে কারবারীরা হাটে আসত—বেঁধে নিয়ে আসত বান্দার দল, বাঁদীর দল। দড়িতে বেঁধে আনত ছাগলের মত ভেড়ার মত গরুর মত। বাজারে আসত গৃহস্থ থেকে আমীর নবাব বাদশাহের লোক। তারা কিনে নিয়ে যেত জবরদস্ত দেখে গোলাম বান্দা—খুবসুরতী নওজোয়ানী দেখে বান্দী। লেকিন, বাবুসাহেব, তাতেও তাদের আত্মা বিক্রী হত না। বান্দা-বান্দীরা দেহে মালিকের কাছে কেনা ছিল—আত্মা ছিল তাদের স্বাধীন। খুদার বিচারে বান্দা বাদশাহ নাই—সে বিচারে এক বান্দা সে হয় বেহেস্তের অধিবাসী আর তার যে মালিক—তাকে যে আশরফি কি রূপেয়া দিয়ে কিনেছিল সে যায় নরকে—দোজখে। কিন্তু শয়তান এই খুদাতায়লার দুনিয়ায় মানুষের আত্মাকে কেনে। যে দাম সে চায় সেই দামই দেয়। এ দুনিয়ার যে কোন দুর্লভ বস্তু হোক। তার বদলে শয়তানের কাছে খত্ লিখতে হবে। লিখতে হবে—মানি না, দয়া না প্রেম না ক্ষমা না সত্য না কুরান না—সব কিছুর মূল বলে যাকে মানুষ মানে সেই খুদাকেও না। ঝুট্ বিলকুল ঝুট্। খুদা ঝুট্ ঈশ্বর ঝুট্—মানি না।"

বলেছিলেন এক ফকীরসাহেব।

দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় গিয়েছিলাম। সেখানে আকস্মিকভাবে এই বৃদ্ধ ফকীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবং আলাপও হয়ে গেল।

'১৯৬০ সাল থেকে আমাকে কর্মসূত্রে দিল্লীতে গিয়ে মধ্যে মধ্যে কিছু দিন থাকতে হত। কাজ খুব বেশী ছিল না। অবসরই ছিল বেশী। এই অবসরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শখ জেগেছিল হারিয়ে যাওয়া পুরনো কালের ইতিহাস আর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি দেখে বেড়ানো। কুতবমিনার তার পাশে অসমাপ্ত মিনার আলাই দরওয়াজা দেখেই খুশী হয়নি মন—সুলতানা রিজিয়ার কবরস্তান খুঁজে খুঁজে দেখে এসেছিলাম। তোগলকাবাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। সেই পুরনো বাজারের দু'পাশের কুলুঙ্গির মত ঘরগুলোর কোন একটাতে বসে সিগারেট ফুঁকেছি আর নানান উদ্ভট কল্পনা করেছি।

বিকৃতমস্তিষ্ক অথচ বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী বাদশাহ মহম্মদ তুগলকের কথা ভেবেছি; চামড়ার পিতলের চাকতি খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি যা নাকি বাদশাহ সোনা রূপার মোহর সিক্কার বদলে মোহর সিক্কা বলে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। অনেক ইরানী তুরানী নারীদের কল্পনা করেছি। তারা অবশ্যই সেই ডবল বেণী ঝুলানো কৃপাণহস্তা ভীমা ভয়ংকরী নয়—তারা অবশ্যই কোমলাঙ্গী সলজ্জ আয়তনয়না চকিত ভীরু দৃষ্টি গোলাপপুষ্পবর্ণা কুঞ্চিতকেশবতী নূপুরচরণা বীণাদণ্ডমণ্ডিতভুজা দুর্লভা বরনারী। ফিরোজ কোটলা লালকেল্লার ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম স্বপ্নাবিষ্টের মত। কেবল হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিস্থলে গিয়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। নির্বাক হয়ে থাকতাম কিছুক্ষণ।

স্থানটি বড় পবিত্র।

সারা মুঘল আমলের শ্রেষ্ঠ ফকীর এখানে সমাধির অভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন। সারা মুঘলবংশের শ্রেষ্ঠ রূপসী এবং মহীয়সী কন্যা জাহানআরা বেগম এখানে সমাধির তলে শান্তিনিদ্রিত। তাঁর সমাধির উপর মর্মরের আচ্ছাদন নেই, আছে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। নিজেকে তিনি দীন জাহানআরা বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর নাকি এক আশ্চর্য রূপ ছিল—তার মধ্যে জাগতিক সৌন্দর্য ছাড়াও আরও এমন কিছু ছিল যার জন্য সর্বভুক যে আগুন সে-আগুন তাঁর দেহের আতরমাখানো ভাঁজে ভাঁজে জড়ো-করা সূক্ষ্ম মসলিনে লেগে জ্বলে উঠে সারা দেহটা পুড়িয়ে তাঁর মুখের সামনে এসে থেমে গিয়েছিল, নিভে গিয়েছিল আপনি। তাঁর সমাধির সামনে এসে যখন দাঁড়াতাম তখন যেন কেমন হয়ে যেতাম আমি।

সারা মুঘল সাম্রাজ্যের কালের শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা গালিব এখানে শায়িত আছেন। তাঁর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কতদিন চোখে জল এসেছে। মনে মনে বলেছি—"আমার এই হৃদয়, এ হৃদয় ইটেরও নয় পাথরেরও নয় কাঠেরও নয়। মানুষের এই হৃদয় আশ্চর্য। 'রুয়েঙ্গে হম হাজারোবার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।' কাঁদতে দাও। আমি কাঁদব—হাজারোবার কাঁদবো—আমাকে কাঁদতে তোমরা কেউ মানা করো না। আমাকে কাঁদতে দাও।"

এর অল্প একটু দূরেই বাদশাহ হুমায়ুনশাহের সমাধি। বাদশাহ নিজের জন্য প্রশস্ত এবং বিশাল সমাধি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে তাঁর বংশের যাঁরা ভাগ্যহত তাঁরা মৃত্যুর পর তাঁরই সমাধির পাশে এসে স্থান নেবেন। শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা শিকো এখানে শায়িত আছেন। হিন্দু মুসলমানের প্রেম এবং ঐক্যের দ্বারা অভিষিক্ত এক নূতন শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হিন্দোস্তান তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন।

দিল্লীর শেষ বাদশাহ—কবি বাদশাহ বাহাদুরশাহ জাফরশাহের

ছেলেদের ফাঁসি দিয়েছিল ফিরিঙ্গীরা, খুনী দরওয়াজায় তাদের দেহ লটকানো ছিল তিন দিন, তারপর সেই শাহজাদাদের দেহ পচল গন্ধ উঠল—তখন তাদের এনে এখানেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

দিল্লীর এই অঞ্চলে একটা আশ্চর্য মোহ আছে। অন্ততঃ আমার জন্য আছে। এই কারণে মধ্যে মধ্যে আসতাম এখানে। ফুল নিয়ে আসতাম, আগরবাতি নিয়ে আসতাম, বাতি নিয়ে আসতাম। ওখানে গাইডদের মধ্যে আফজল বলে একজন লোক আছে। আফজলকে আমি টাকা দিয়েছি—সে আউলিয়া সাহেবের দরগাহে বেগমসাহেবার সমাধির পাশে এবং মির্জা গালিবের সমাধির ধারে ইসলামী পর্বে একটি করে চেরাগ জ্বেলে দিত। এই আফজলই আমাকে এই ফকীর-সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

আফজল বাঙালী মুসলমান এবং আমার জেলা বীরভূমের লোক সে। নলহাটী তার বাড়ি ছিল। লীগ আমলে একজন লীগ নেতার সঙ্গে এসেছিল দিল্লী। ছিল তাঁর খানিসামান মানে খানসামা; পরে লীগের ভাগ্যপরিবর্তনের সময় সকলে চলে গেল পাকিস্তান, সে এখানে থেকে গেছে। পাকিস্তানেও যায়নি, দেশেও ফেরেনি, এখানেই থেকে গেছে। মুসলমান যাঁরা তাঁদের কাছে অনেকটা পাণ্ডাগিরি করে। নিজে বাতি লাবান আগরবাতি ফুল রাখে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়, অমুসলমানদের গাইডের কাজ করে। উর্দু ভালই বলে, ইংরিজীও বলে ভাঙা ভাঙা।

Hazrat Nizamuddin Aulia—Fakir Sab—great Fakir—not dead but sleeping only. He talks in dream when you sleep, understand. Ask anything not me—him ; ask in mind and he will say answers in dream.

আমার সঙ্গে কিন্তু সে উর্দু বা ইংরিজীতে কথা বলেনি—আমার

পরনে কাপড় ফ্লানেলের পাঞ্জাবি আলোয়ান বিশেষ করে কোঁচার ঢঙ দেখে সোজাসুজি বাংলায় বলেছিল—আসেন বাবুজী, আসেন; আমি সব দেখাব বাবুজী—আপনি বাঙালী আমি বাঙালী—সব জানি আমি; আসেন।

সেই মুহূর্তে 'আ মরি বাংলাভাষা' গানটি গুঞ্জন করে উঠেছিল তা মনে পড়ছে এবং তাকেই গাইড নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার দিকে যেতে যেতে যে কটা কথাবার্তা হয়েছিল তারই মধ্যে তার নাম আফজল শেখ বাড়ি বীরভূম জেলায় নলহাটীর পাশেই এবং আমার নাম আমার বাড়ির ঠাঁই ঠিকানা পরস্পরের কাছে জানা হয়ে গিয়ে আমি হয়ে গিয়েছিলাম তার 'দাদাবাবু', সে হয়ে গিয়েছিল 'আফজলভাই'। তাই মর্যাদাটা কতটা খাঁটী কতটা মেকী বা মৌখিক সে বিচার করবার মত পরীক্ষা কোনদিন আসেনি এটাকে আমি সৌভাগ্যই মনে করি তবে আফজলের একটি ইজ্জতবোধ এবং রাজধানীর একটি শিক্ষা তাকে মোটামুটি একটা মর্যাদা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বীরভূমের নলহাটি অঞ্চলের এই মুসলমান তরুণটি তার আঞ্চলিক সেই বিচিত্র টানযুক্ত ভাষায় বাড়ি কুথা হে তুমার?—আমার বাড়ি? প্রশ্ন দুটিকে অতি সুন্দর সুমানান করে 'জনাবকা দৌলতখানা আর মেরি গরীবখানা' বলে যখন উপস্থিত করত তখন কানে বা মনে এতটুকু হুঁচোট খেতো না। এবং মোটা-মুটি ইতিহাস ও কাহিনী তার সঙ্গে সমাধি-মন্দিরগুলির গঠনবৈশিষ্ট্য এ সবই আয়ত্ত করেছিল।

এই আফজল আমাকে আবার দেখালে এই ফকীরসাহেবকে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস। সারা ভারতবর্ষে তখন আকস্মিক সংঘটনে একটা আলোড়ন জেগে উঠেছে; চীন ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের বিরাট পার্বত্য অঞ্চল দখল করে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি আরও অনেক অংশ দাবি করেছে যাতে হিমালয়ের প্রাচীরটাকে নিজের

সীমানার মধ্যে পুরে হিমালয়ের পাদদেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে সমতল ভারতবর্ষকে অনায়াসে লেহন করতে করতে নিঃশেষিত করতে পারে। নেফা অঞ্চলে, বাঁধ ভেঙে চীনা সৈন্যবাহিনী জল-স্রোতের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে থমকে গেছে। ভারতবর্ষের মুখ কালো হয়ে গেছে তার নিজের অক্ষমতার জন্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন গোটা জাতটাকে অক্ষমতার এই লজ্জা থেকে বাঁচাতে। আহ্বান দিয়ে সকলকে কাছে ডাকছিলেন। সে আহ্বানে আলোড়ন জেগেছিল। যে-আলোড়নে যেন রাতারাতি সারা হিন্দুস্তানের মানুষ বদলে গিয়েছিল। দিল্লীতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসছিল তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দান দেবার জন্য। নেফার যুদ্ধে নিহত এক পাঞ্জাবী বীরের স্ত্রী এসেছিলেন তাঁর একমাত্র ষোল বছরের ছেলেকে নিয়ে—যুদ্ধে পাঠাবেন। এক রাজপুত চাষী এসেছিল তার দুই নাতিকে নিয়ে—তাদের দেবে নেহেরুজীর হাতে, তারা লড়বে দুশমনের সাথে। এক অন্ধ সন্ন্যাসী এসেছিল তার একখানি মাত্র দামী কম্বলখানি দেবার জন্য; হিমালয়ের উপরে দারুণ শীতে হিন্দুস্তানের জোয়ানদের একজনও গায়ে দিতে পারবে। মা বাপকে সঙ্গে নিয়ে এক বারো বছরের লেড়কী এসেছে—তার সব অলঙ্কার সে দিয়ে দেবে লড়াইয়ের জন্যে। দিল্লীতে দান নেবার জন্যে নানাস্থানে আপিস খোলা হয়েছে। রিক্রুটিং আপিস বসেছে। ১৯৬৩ সালের শীত ছিল দুরন্ত শীত। দিল্লীতে তাপমান হিমাঙ্কে এসে ঠেকতে চাচ্ছিল। তার মধ্যেও জীবন হয়ে উঠেছিল সক্রিয় সতেজ।

জানুয়ারীর ২০।২১।২২।২৩ পার্লামেন্টের একটা অধিবেশন হয়েছিল। বোধহয় ২৪ পর্যন্ত। নেহেরুজী সামরিক অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টের সভ্যদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

এই উপলক্ষে আমিও গিয়েছিলাম। এবং একদিন গিয়েছিলাম

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায়। সেইখানেই আফজল বললে এই ফকীরসাহেবের কথা।

সে সময় আমার দেহ এবং মন দুইই একেবারে প্রচণ্ড আঘাতে আহত, বিপর্যস্ত। '৬২ সালের অক্টোবরে আমার বড়জামাই মারা গেছেন। আমার বিধবা কন্যা এবং তার ছেলেমেয়েরা তখন মুহ্যমান। তার উপর ছেলেটির হয়েছে কঠিন অসুখ। আমি নিজে পড়েছি ভেঙে।

আমার সেদিনের সে চেহারা দেখে আফজল চমকে উঠে বলেছিল—এ কি চেহারা হয়েছে আপনার দাদাবাবু!

বিষণ্ণ হেসে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সংক্ষেপে বিবরণটুকু বলতেই আফজলও যেন মুহ্যমান হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সেই বললে—এক পীরসাহেব—পীর বোঝেন তো, সিদ্ধ ফকীর, এখানে এসেছেন রয়েছেন। দেখা করবেন দাদাবাবু? তাঁর 'দোয়া' হলে সব ভাল হয়ে যাবে এ একেবারে নির্ঘাৎ।

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব? শান্তির (আমার জামাই) অসুখের সময় সাধু সন্ন্যাসী দেবতা গোস্বামী জপ হোম মানসিক এ তো কম হয়নি। আমার গৃহিণী তো বাকী রাখেন নি!

আফজল বললে—এইখানেই আছেন। খুব ভাল লোক!

হাসলাম। লোক ভালই হোক আর মন্দই হোক জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব যেখানে সেখানে দুইয়ের দামই যেন সমান; বিধাতা কাউকেই কোন দামই দেন না, ভালকেও না মন্দকেও না; দিলে একেও একটা কানাকড়ি ওকেও একটা কানাকড়ি দিয়ে পথের ধারে ফেলে দিয়ে যান। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা করলাম। 'দেখা করলাম' ঠিক হল না—দেখতে গেলাম। এদেশের মানুষ তো।

দেখে অনুশোচনা হল না। সত্যই চোখে যেমন ভাল লাগল তেমনি ভাল লাগল কথাবার্তা বলে। সংসারে একধরনের মানুষ আছে

যাদের কথাবার্তার আসল মানে হয়তো আবোলতাবোলের সামিল কিন্তু ভারী ভাল লাগে শুনতে। কারণ সে আবোল-তাবোলে তোমার এতটুকু ক্ষতি হবে না। তবে বলনেওয়ালা হিসেবে সাচ্ছা মানুষ। উনিই বললেন—দুনিয়াতে শয়তান মানুষের আত্মাকে কেনে। সেই আদিকাল থেকে কিনে চলেছে। কি তার হিসাব? না—কিনতে কিনতে কিনতে একদিন সে তামাম মানুষের আত্মাকে কিনে ফেলবে। বাস—আল্লাহতায়লার সঙ্গে লড়াই ফতে। দুনিয়ার সব মানুষ যখন তার কেনা তখন দুনিয়ার মালিক আর খুদা নন—দুনিয়ার মালিক সে।

—"কভি কভি কার-কারবারকা মৌকা আতা হ্যায়। যেইসা বরখামে পানি হোতা হ্যায়, বসন্ত্‌মে ফুল হোতা হ্যায়—"

বাবুজী, ঠিক তেমনিভাবে মানুষদের মধ্যেও আসে এক-একটা সময়। দেখছ না বাবুজী কি সাড়া পড়েছে তামাম মুলুক ভর? লোকে নিজেকে দেবার জন্য যেন তৈয়ার—লেও জী লে লেও হামারা সবকুছ—হামারা বিলকুল—মেরা জান ভি জিন্দিগী ভি লে লিজিয়ে। লে লেও বাবা! এ-সময় শয়তান আসবে। ঠিক আসবে। এসে বলবে—কেন? এমনি দেবে কেন? আমি তোমাকে দাম দেব। বল কি দাম চাই? বল? দেব নিশ্চয় দেব। জরুর দুংগা। আওরৎ শরাব সোনে চাঁদি জহরৎ—যো কুছ মাংতা। লো—।

তারই খোঁজে আমি বেরিয়েছি বাবুজী। তারই খোঁজে। সে বের হবে এই সময়ে। এমনই সময়ে সে বের হয়।

* * *

এমনি সময় দুঃসময় যখন আসে তখনই সে তার দোকান খুলে বসে। যে মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারা যায় এই মানুষটা বুকের ভিতরকার কোন তাপে জ্বলছে তাকেই ডেকে বলে—কি সাহেব তোমার ভিতরের দুখটা বেচবে? আমি সুখ দিয়ে কিনব।

যে বেচতে রাজী হয় সে সুখ যখন পায় তখন দেখে বুকের সেই দুঃখের সঙ্গে তার আত্মাকেও সে বেচে দিয়েছে।

জীবনের সুখকে বেচা যায় দান করা যায় কুরবানি করা যায় কিন্তু দুঃখ দর্দ—এ বেচা যায় না। আত্মার সঙ্গে আলগ্ করা যায় না। ভারী একটি মজার কথা বলেছিলেন ফকীর। একালে এই ধরনের কথা মানুষেরা বলে না; কথাটা মনের মধ্যে আমার গেঁথে রয়েছে। বলেছিলেন—দেখ বাবুজী সব ফলের দেখতে পাবে তিনটে ভাগ। উপরের খোসা তারপর শাঁস তারপর আঁটি নয় বীজ। আম ধর না বাবুসাহেব। ওর আঁটি হল আত্মা—শাঁস হল তার দুঃখ দর্দ—আর খোসা হল তার সুখ। খোসাটা কেবল বর্মের মত বাঁচায়। দুঃখের শাঁস থেকেই বীজ আঁটি বাড়ে ডাঁটো হয়। আঁটি থেকেই হয় গাছ বাবুজী। শাঁস তো অন্যের খাবার জন্যে নয়—ওটা তৈরী হয়েছে আঁটির জন্যে। আমরা জবরদস্তিতে খেয়ে নি। বীজ আঁটি বরবাদ হয় তার জন্যে।

দুঃখ আর দর্দ এ বেচলেই শুধু দুঃখ দর্দই যায় না তার সঙ্গে আত্মাও চলে যায়। হঠাৎ হেসে ফেলেছিলেন ফকীরসাহেব; বলেছিলেন—আমি কাল রাত্রে এখানে এসেছি। আজ এই সকালে না এসে যদি সন্ধ্যেবেলা আসতে তাহলে দেখতে পেতে বাবুজী বড়ে বড়ে আদমী আমীর উজীর আজকালের মিনিস্টার লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। আমার কাছে আসে! কি? না বহুত্ ডর্ লাগছে। কেন? না এমন কাম করে ফেলেছে যে মনে হচ্ছে জান খতম না করলে আর পার নেই। কেউ এমন আওরতের পাল্লায় পড়েছে যে—। এর আর শেষ নেই বাবুসাহেব। কেউ কেউ আসে আমার কাছে রূপেয়া দিয়ে দুখের বদলে সুখ কিনতে। ছোট মিনিস্টার থেকে বড় মিনিস্টার করে দাও। আমি ফিরিয়ে দি। তারা কিন্তু মানে না। তারা অহরহ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই বিচিত্র বানিয়াকে যে আত্মার মূল্য

নিয়ে দুঃখের বদলে তাকে সুখ দেয়। সে ছদ্মবেশে তাদের পিছন পিছন ফেরে—হঠাৎ কোন নির্জনে পিছন থেকে পিঠে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা দিয়ে বলে—এই আমি আছি। এস। বল কি চাই? বল! সে কারবার অহরহই চলছে দুনিয়ায়। গোপন কারবার। অত্যন্ত গোপন। কিন্তু এই সময়ের মত সময় আসে যখন কারবার চলে প্রকাশ্যে। আফজল বলছিল তুমি দেহাতের মানুষ। বাবুজী, দেহাতে দুর্যোগের রাত্রে 'ডাকাইতি' দেখেছ? ডাকাইতরা মশাল হাতে নিয়ে আসমান আর ধরতিকে কাঁপিয়ে হল্লা তুলে গাঁওয়ে ঢুকে পড়ে?

বাবুজী, হিন্দুস্তানের উত্তর তরফে হিমালয় পাহাড়ের মত পাহাড়ের উপরেও জমীন নিয়ে হামলা হচ্ছে। চীনা লোকেরা এসেছে জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতে। এই কালের সঙ্গে দেহাতের বর্ষার রাতের ডাকাইতি হামলার তফাৎ কি বল?

এমন রাত হিন্দুস্তানে তো কম আসেনি বাবুজী! অনেক অনেক। কিতাবে লেখা আছে। মানুষেরা পুরুষানুক্রমে শুনে শুনে মনে করে রেখেছে। আমার উমর কম হল না বাবুজী—কমসে কম তো পঞ্চআশী হয়ে গেল। এই তো ক'বছর আগে মিউটিনির শও বরিষ পুরা হল। বচপনে সেই কথাই শুনেছি। সে সময় শুনতাম খুদ শয়তান নাকি মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে মশাল আর তলোয়ার হাতে ছুটে বেড়াত। কানপুরে নানাসাহেব ইংরেজদের বাত দিয়ে বাতের খেলাপ করে গুলি করে মেরেছিল। আমার দাদো বলত—নেহি। নানাসাহেবকে জোর করে এই বাতখেলাপী গুনাহ করিয়েছিল সেই শয়তান। দাদো আমার সিপাহীদের দলে ছিল। সে নিজে চোখে দেখেছিল নানাসাহেবের পাশেই এক ঘোড়সওয়ার ছিল। তার পা দুটো মানুষের পা ছিল না। খুব হুঁশিয়ারির সঙ্গে ঢেকে রাখত। দাদো হঠাৎ দেখে ফেলেছিল। সে দাদোকে অনেক টাকা সোনা রূপা দিতে চেয়েছিল। দাদো তা নেয় নি। রাত্রের অন্ধকারে ছাউনি ছেড়ে চলে এসেছিল। জানোয়ারের

পায়ের মত পা—খুব যত্ন করে ঢাকা, বাকীটা একেবারে মানুষের মত। যেমন তেমন মানুষ নয় বহুৎ জৌলুসী মানুষ, কথায়বার্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়—হা-হা হেসে হাওয়া কাঁপিয়ে দেয়—সে গান করলে নেশা ধরে, নেশার তেষ্টা পায়। আওরতের পায়ে ঘুঘট বাজতে থাকে, দেহ দুলতে থাকে. বাবুজী, শয়তান যত জবরদস্ত তত সে চতুর জাদুগর। জীবনে জাদু লাগিয়ে দেয়।

(দুই)

বেশ লাগছিল শুনতে। তাছাড়া ফকীরসাহেব খুব ভাল বলনেবালা! ফকীরসাহেব খুব পড়াশুনা করা বিদ্বান মৌলভী নন, খুব গোঁড়া মোল্লাও নন। অথচ শক্তিসম্পন্ন মানুষ। নিঃসন্দেহে শক্তি-সম্পন্ন মানুষ। আমাকে দেখেই বলেছিলেন—"বাবুজী, তুমি তো হালে এক বড়াভারী চোট খেয়েছ দেখছি! তোমার উপর আরও ঘা আসছে। তোমার নিজের উপর। হুঁশিয়ার থেকো বাবুজী। আদমী হিসেবে তোমাকে ভাল লেগেছে তাই বলছি।"

এইটুকু বলার জন্যই ফকীরকে শক্তিশালী মানুষ বলছিনে—বলছি অন্য কারণে। তাঁর এই যে শয়তান গুনাহ নসীব কিসমৎ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্বাস—সে যত সস্তা পুরনো এবং অসারই হোক না কেন, অন্যের কাছে তাঁর কথায় তাঁর বিশ্বাসে তাই অনন্যসাধারণ হয়ে উঠত।

তর্ক করে তাঁর অন্ধবিশ্বাসকে কেটে ফেলা যেত বা যেত না জানিনে কারণ সে তর্ক আমি করিনি—তবে এটা বলতে পারি তাঁর বিশ্বাসকে তাঁর মন থেকে টলাবার শক্তি কারুরই ছিল না।

দিল্লীতে জুমা মসজেদের উত্তর-পূর্বদিকের ময়দানে সারমাদ নামে

এক ফকীরের সমাধি আছে। মোল্লা মৌলবীদের জিন্দাপীর বাদশাহ ঔরংজেব তাঁকে কাজীদের বিচারমত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সারমাদের অপরাধ ছিল—তিনি উলঙ্গ থাকাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং নিজেও উলঙ্গ থাকতেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সারমাদ এতটুকু ভীত বিচলিত হননি--তিনি জহ্লাদের কুড়ুলের নীচে পাথরের উপর মাথা রাখবার সময় রুবাই রচনা করে গেয়ে উঠেছিলেন—“আ—আজ আমার প্রিয়তম এলেন আমায় বুকে নিতে উদ্যত নগ্ন তরবারির বেশে।” আজও দলে দলে মানুষ তাঁর সমাধিস্থলে আসে—মাথা ঠেকিয়ে যায়; চেরাগ ধূপ-লাবান জ্বেলে দিয়ে যায়।

মৃত্যুবরণ করেও সারমাদ উলঙ্গ থাকাই শ্রেষ্ঠ পন্থা একে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কিন্তু জিন্দাপীর বাদশাহ ঔরংজীবের দণ্ড এই সত্যকে তাঁর জীবনে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেনি।

এই ফকীরসাহেবের নিজের সত্য তেমনি সত্য। তা কোন তর্কে পরাজিত হবার নয়। কোন ব্যঙ্গে মিথ্যা হয়ে যাবে না। তাঁর সত্য—শয়তানের পা দুটো জন্তুর মত এবং সে দেহাতে বর্ষার দুর্যোগরাত্রির মত কাল যখন দেশে আকস্মিকভাবে আসে তখন সে ওই জন্তুর মত পা নিয়ে দুর্যোগে বিভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে ফলাও কারবারের গদি খুলে বসে এবং বড়াভারী ওকীলদের মত ওকালতি করে ডাকে মানুষকে।

—বিলকুল সব ঝুট হ্যায় ধোঁকাবাজি হ্যায়—ধরম ঝুটা ইমান ঝুটা বেহেস্ত ঝুটা; খুদা ঝুটা। সাচ্চা হ্যায় জিন্দিগী। এই জিন্দিগীর জন্যে সুখ নিয়ে যাও।

আমি অবাক হয়ে শুনেছিলাম।

সেবার এই পর্যন্ত। সেদিন চলে এসেছিলাম—বেলা অনেকটা হয়ে গিয়েছিল। দিন তিনেক পর আবার একবার গিয়েছিলাম কিন্তু ফকীরসাহেবের দেখা আর পাইনি। আফজল আমাকে বলেছিল ফকীরসাহেব সেই দিন রাত্রেই চলে গেছেন।

সে বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য কথা বলেছিল এরপর। বলেছিল—রাত তখন দশ ঘড়ি বাজছে—ফকীরসাহেব জপের মালা নিয়ে জপ করছিলেন, হঠাৎ জপ থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন—নেহি নেহি নেহি—! নেহি হো সক্তা। আফজল—! আফজল!

আফজল ছুটে এসেছিল। ফকীরসাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের ঝোলাটা আর কম্বলখানা তুলে নিয়ে বলেছিলেন—আমি চললাম আফজল আমি চললাম। শয়তানের কুত্তাটা লাশটা টেনে উপরে তুলছে। না না না। কভি নেহি হো সক্তা!

আফজল বলেছিল—রাত্রেই চলে গেলেন। মথুরা লাইনে—মথুরার টিকিট কিনে দিয়েছি আমি।

* * *

এরপর দেখা হল আর একটা আলোড়নের সময়।

সে আলোড়নের জাত আলাদা।

সমস্ত দেশ তখন চোখের জলে ভাসছে। সারা হিন্দুস্তান ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের আদিপর্বের উজ্জ্বলতম প্রাণময় পুরুষ জওহরলাল নেহেরু মারা গেছেন।

পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশন বসবে বেলা এগারটায়। প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রাণময় পুরুষ বিবৃতি দেবেন চীন সীমান্ত সম্পর্কে। ইতিমধ্যে সীমান্তের দিকে নানা বিপর্যয় ঘটেছে—নানান অন্তর্ঘাতী হীন কর্মের ফলে ভারতবর্ষের অন্তর্দাহ এবং আত্মগ্লানির শেষ নেই; সেই সম্পর্কে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ঝড় উঠবে। অব্যবহিত পূর্বে এই মহিমময় পুরুষ হৃদ্‌পিণ্ডের ধমনী ছিন্ন হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বুকের রক্ত নিভৃতে বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আত্মবলি দিলেন। এর ফলে আকস্মিক আঘাতে বেদনায় মুহ্যমানতায় দেশ মুহ্যমান হয়েছিল তা মানুষ ভোলেনি। সেই সময়।

পণ্ডিতজীর অন্ত্যেষ্টির পর।

দিল্লী থেকে রওনা হয়েছিলাম আর দিল্লী আসব না মনে করে। ফেরার পথে নেমেছিলাম প্রথম মথুরায় তারপর আগ্রায়। কয়েক দিন আগ্রায় থেকে মোটামুটি শেষবারের মত ভেবে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম অঞ্চলটা। তাজমহল আগ্রা কেল্লা ইত্‌মাদউদ্দৌলা সেকেন্দ্রা ফতেপুর সিক্রী দেখেছিলাম।

সেকেন্দ্রায় গিয়ে আবার দেখা হয়ে গেল ফকীরসাহেবের সঙ্গে।

এবারও সেই আফজল হল যোগসূত্র। না-হলে ওই একবার-মাত্র দেখার স্মৃতিতে আমারও ফকীরসাহেবকে চিনতে পারার কথা নয়; তাঁরও নয়। আফজলই চিনলে আমাকে এবং ব্যগ্র এবং উৎসুক প্রীতিশ্রদ্ধার সঙ্গে বললে—দাদাবাবু?

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। চিনতে দেরি হল। কারণ এবার সে দাড়ি রেখেছে। ফকীরদের মত একটা আলখাল্লা ঢঙের লম্বা পাঞ্জাবি বা জামা পরেছে। চিনতে দেরি হচ্ছিল দেখে সে নিজেই বললে—আমি নলহাটীর আফজল। সেই দিল্লীতে হজরত নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া সাহেবের—

—আ—ফ—জল! মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম আমি।

—হ্যাঁ দাদাবাবু। আমি ফকীরসাহেবের চ্যালা হয়েছি। সেই—সেই ফকীরসাহেবকে মনে আছে তো? সেই আপনাকে বলেছিলেন শয়তানের করণের কথা মতলবের কথা!

এক কথাতেই মনে পড়ে গেল। বললাম—তাঁর শিষ্য হয়েছ তুমি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু।

—আচ্ছা—! একটু হাসলাম আমি।

—দেখলেন তো কি ঘটালে?

—কি বলছ?

—শয়তান কি ঘটালে দেখলেন? নেহেরুজীকে জানটা দিতে হল! দেখলেন তো!

বেশ একটু বিস্ময় উদ্রিক্ত হল। সে বিস্ময় বোধ করি আমার দৃষ্টিতে খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। আফজল তা অনুভব করেই বললে—গুরু মানে ফকীরসাহেব আমাকে বলেছিলেন।

—বলেছিলেন? কি বলেছিলেন? নেহেরুজী মারা যাবেন—বলেছিলেন তিনি?

—না। নেহেরুজী বলেন নাই। বলেছিলেন—আফজল আব তো বেটা বড়াভারী এক কুরবানি হোগা। কুরবানি হোগা তো হিন্দুস্তান বাঁচেগী—নেহি হোগা তো শয়তানকে রাজকে লিয়ে হামলা লড়াই শুরু হো যায়েগা! নেহেরুজীর ইন্তেকালের খবর হল রেডিয়োতে, ফকীরসাহেব বললেন—শয়তান হঠল আফজল। বড়া-ভারী কুরবানি রে!

ফকীরসাহেবের সেই গল্পগুলো মনে পড়ছিল। মানুষের সঙ্গে মিশে শয়তান ঘুরে বেড়ায়। মানুষের মনের বাসনা বুঝে পিঠে হাতের আঙুলের টিপের ইশারা দিয়ে ডাকে—এস—বল কি চাও? যা চাও তাই পাবে। বল!

খুব সতর্ক দৃষ্টিতে খুঁজলে দেখতে পাবে সুন্দর সুপুরুষ একজন মানুষ—চমৎকার সাজপোশাক কিন্তু পায়ের দিকটা জন্তুর মত। সেই—সেই জেনো সে।

আফজল বলে—আমি চোখে দেখলাম দাদাবাবু একটা কুকুর—ভয়ংকর কুকুর। এই কা—লো। এই বড়। মিশকালো রঙের মধ্যে দুটো চোখের মণি আগুনের মত জ্বলে। আর চোখ দুটোর বাইরে কালোর উপর সাদা রঙের গোল বেড়। কবর খুঁড়ে একটা মানুষের মাথা তুলে নিয়ে গেল। ফকীরসাহেব অনেক কষ্টে তার পিছনে পিছনে গিয়ে কেড়ে আনলেন সেটা। তখনই বললেন

গুরু—আফজল, বেটা, বড়া ভারী এক কুরবানি হোগা! বড়া ভারী কুরবানি।

* * *

—হ্যাঁ বাবুজী। আফজল ঝুট্ বাত বলেনি। বলেছে সত্যি। একটা কুকুর একটা মানুষের মাথা কবর খুঁড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি ছিনিয়ে এনেছি।

—বাবুজী, আফজল দেখেছে সে মাথাটা। মনে নিচ্ছিল কি তাজা কোতল করা গর্দানা—টপটপ করে খুন যেন ঝরছিল। আর দুটো চোখ নেই—চোখ দুটোকে কুঁরে তুলে নিয়েছে, নাকটা কেটে নিয়েছে, কান দুটো তাও নেই। সব জায়গায় কাঁচা জখমী দগদগ করছে। আফজল ডরকে মারে চিৎকার করে উঠেছিল। উসকে বাদ বেহোঁশ হোকে গির গিয়া।

চোখ দুটো তাঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল—স্থির নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ফকীর বললেন—শোচকে দেখিয়ে কি করিব এক শ-ও আশী বরিষ পহেলে—

আন্দাজ একশো আশী বছর আগে এই মুণ্ডটাকে ধড় থেকে পৃথক করা হয়েছিল। জহ্লাদের এক কোপে কাটেনি। দুর্দান্ত মানুষ—বিশালকায় জোয়ান—বৃষস্কন্ধ পুরুষ। শয়তানের সঙ্গে কারবার করেছিল। নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিল সে। শয়তানের জাদুতে আর জালিয়াতিতে, জানোয়ারের হিংসায় সারা হিন্দুস্তানের নসীবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বাদশাহীকে খতম করে দিয়েছিল সেই। বাদশাহ শাহ আলমের বুকে বসে চোখ দুটো ছুরি দিয়ে তুলে নিয়ে—তার হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখে দিয়েছিল দিল্লীর ধূপের মধ্যে লালকিল্লার খোলা ময়দানে। বাদশাহকে কেউ যেন পানি না দেয়—তার জন্যে সাজার ভয়ে খাড়া করেছিল তিনজন বাদশাহী নোকর আর দুজন পানিবরদারকে জখম করে ফেলে রেখে। বাবুজী,

বাদশাহী হারেমের বালবাচ্চা জেনানী শাহজাদা শাহজাদী বেগম সব কোইকে উপোষ করিয়ে রেখেছিল—বাচ্চারা দুধ পায়নি, কেউ এক দানা খানা পায়নি। চার রোজের বাদ মরতে লাগল তারা। বাবুজী, দুজন বাদশাহী বেগম না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেল, একুশজন শাহজাদা শাহজাদী মরল। তাদের কবর পর্যন্ত দিতে দেয়নি। দিল্লীর ধুপে লাশ পচল।

শয়তান তাকে করালে।

শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিল সে। পরে তার মাসুল সে দিয়েছিল। কিন্তু মরবার সময় আমার গুরুর গুরুকে বলেছিল—হজরত, এতটুকু মেহেরবানি আপনার কাছে চাইব আমি! আমার মুণ্ডুটা ধড় থেকে কেটে ফেলে দেবে—হয়তো বাদশার কাছে পাঠাবে; হজরত, আমার এই মুণ্ডুটা আপনি নিজে হাতে কবর দেবেন। দেখবেন যেন কোনমতে আমার মুণ্ডহীন দেহটার সঙ্গে এটাকে কেউ জুড়ে দিতে সুযোগ না পায়! আমি জানি হজরত আমার মুণ্ডহীন দেহটা নিয়ে যাবে সে। শয়তান। নিজেকে আমি বেচেছিলাম হজরত। তার মাসুল এই। মরেও নিষ্কৃতি নেই। সে আমার কাটামুণ্ড আর ধড় মিলিয়ে দেবার সুযোগ পেলে আমার নিস্তার থাকবে না। প্রেত হয়ে আমাকে শয়তানের সিপাহসালার হতে হবে। হিন্দুস্তানে যখনই খুন-খারাবী লড়াই দাঙ্গা হবে তখন শয়তান এসে আমার মুণ্ডু খুঁজে বেড়াবে।

পঁচাশী বছর বয়সের ধর্মান্ধতার সংস্কারে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষটির কথায় বিশ্বাস করতে পারা কঠিন—কিন্তু আগেই বলেছি এই বৃদ্ধ ফকীর একজন কাহিনী বোলনেবালা বটে।

বৃদ্ধ বলেই চলছিলেন।—মিউটিনির সময়, আমার গুরুর আমল তখন। গুরুর গুরু দেহ রেখেছেন। মরবার সময় তাঁর শিষ্যকে বলে গিয়েছিলেন…ভার দিয়ে গিয়েছিলেন শিষ্যকে।

বলেছিলেন—হিন্দুস্তানে খুনখারাবী লড়াই দাঙ্গার সময় হুঁশিয়ার বেটা। তখনই সে আসবে এই মুণ্ডুর খোঁজে। ধড়টা সে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন—কি, বিশ্বাস করতে পারছ না বাবুসাহেব? তা পারবে না। একালের আংরেজী জানা আধা-ফিরিঙ্গী তোমরা—বিশ্বাস কম্না কঠিন—কিন্তু খয়রুদ্দিন সাহেবের হকিকৎ ইতিহাস পড়ে দেখো। তাতে সে লিখে গিয়েছে। গোলাম কাদেরের মুণ্ডহীন ধড়টার পায়ে বেঁধে বাদশাহী সড়কের পাশের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল—পা ছুটো ওপরের দিকে কাটা গর্দানটা নীচের দিকে—তার থেকে রক্ত ঝরছিল টপটপ করে। সিন্ধিয়ার হুকুমে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গোলাম কাদেরের গর্দান গেছে। লোকে হঠাৎ দেখলে একটা আশ্চর্য কুকুর এল কোথা থেকে? এই এত বড়। ঘন কালো রঙ—চোখের তারা ছুটো যেন আগুনের আংরা আর সেই চোখের বেড়ে গোল সফেদ একটা দাগ। সে এসে বসল ওই মুর্দা যেখানে ঝুলছিল ঠিক তারই নীচে। টপটপ করে রক্ত পড়ছিল আর কুকুরটা তার লম্বা লকলকে জিভ বার করে সেই রক্তের ফোঁটাগুলি ধরে ধরে নিয়ে খাচ্ছিল। সে মুর্দাকে আর নামানো যায়নি বাবুজী! খয়রুদ্দিন সাহেবের কিতাব তুমি দেখো—তাতে লেখা আছে বাদশাহ সিন্ধিয়াকে হুকুম পাঠিয়েছিল—গোলাম কাদেরের ধড় পাঠাও। কিন্তু ওই কুত্তার ভয়ে কেউ কাছে যেতে সাহস করেনি। শেষে ওই কুত্তা লাফ দিয়ে উঠে ওই লাশের দড়ি দাঁতে কেটে নীচে ফেলে মুখে করে তুলে নিয়ে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। বাবুজী, সে ধড়কে শয়তান এখনও রেখে দিয়েছে—এমনি যখন ডামাডোলের বাজার হয়—যখন দাঙ্গা বাধে লড়াই বাধে মুল্লুকে তখন সে খোঁজে ওই মুণ্ডুটা। ওটাকে এনে জুড়ে দিলেই গোলাম কাদের প্রেত হয়ে উঠবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে সাহেব। গোলাম কাদের অনেক ছুঃখে পড়ে বেচেছিল তার আত্মাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর বিপর্যস্ত হিন্দুস্তান। আফগানিস্তানে আমেদশাহ আবদালী মারা গেছে—পাঞ্জাব টুকরো টুকরো হয়েছে—দক্ষিণে মারাঠারা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে—ওদিকে ভরতপুরে জাঠদের পালায় খানিকটা ছেদ পড়েছে—জবাহির সিং জাঠ খুন হয়েছে, গাজিউদ্দিন উজীর হার মেনে দিল্লীর এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলা পাঠান মেয়ের হাতের ছুরি খেয়ে শেষ সারা দেহে পচ ধরে তিলে তিলে মরেছে।

বাংলা মুলুকে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হেরেছে; মীরজাফরের শয়তানের মত বেটা মীরন তাঁকে খুন করিয়েছে; তারপর মীরন নিজে বজ্রাঘাতে মরেছে; মীরজাফরেরও নবাবী গেছে; মীরজাফরের পর মীরকাসেম আলি খাঁও তার নবাবীর পালা শেষ করেছে। দিল্লীর জুমা মসজেদের সিঁড়িতে খুন হয়েছে ছুরি খেয়ে। ফিরিঙ্গী কোম্পানি দেওয়ানী নিয়েছে বাংলার।

গোটা হিন্দুস্তান তখন ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে।

ফকীরসাহেব বললেন সেদিন—সবকুছ ওহি শয়তানকে মতলবসে হুয়া বাবুজী। বিলকুল—।

রোহিলা পাঠান—এই এতবড় পাথরের মত ছাতি—একটা শালগাছের গুঁড়ির মত শক্ত মানুষ—শেরের মত আদমী ছিল খান-ই-খানান নবাব নাজিবউদ্দৌলা। দিল্লীর বাদশাহের সিপাহ্‌সালার। তার ছেলে নবাব জবিতা খান। তার ছেলে গোলাম কাদের।

বাবুসাহেব, সেই ডামাডোলের বাজারে এই গোলাম কাদের বেচেছিল তার আত্মাকে।

(তিন)

বাবুজী, 'বামনউলী' নামে একটি গাঁও আছে। দিল্লী শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে। সেই গ্রামে নট ব্রাহ্মণের একটা পাড়া ছিল।

নট ব্রাহমণ জান বাবুজী? নট ব্রাহমণদের পুরানো কালে ধর্ম কি ছিল পেশা কি ছিল তা জানি না—তবে সেই মুঘল আমল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত গানা-বাজনা-নাচ্‌না নিয়ে থাকত। সাধারণ ব্রাহমণদের সঙ্গে চলত্‌ এদের ছিল না, তারা তাদের শুধু নট বলত, 'গন্ধর্বী'ও বলত। এদের ধরম-করম সবই ছিল এই গান। বড় বড় উস্তাদ এদের বংশে জন্মেছে। বড় বড় বাঈ জন্মেছে এদের বংশে। এরা জন্মায় গলায় গানের সুর নিয়ে আব মগজে গান বাজনার জ্ঞান নিয়ে আর অন্তরে গানবাজনার জন্যে এক আকুল তৃষ্ণা নিয়ে।

মাণ্ডুর বাজবাহাদুর পাঠান সুলতানের পিয়ারী রূপমতীর নাম শুনেছ বাবুজী—সে গানবাজনায় সিদ্ধ বাঈ ছিল—সে দীপক গাইলে আগুন জ্বলত মল্লার গাইলে বর্ষা নামত; সে বাঈ বাজবাহাদুরকে এমন ভালবেসেছিল যে তার মৃত্যুর পর মুঘল আমীর তাকে যখন তার পিয়ারী হতে তাঞ্জাম পাঠালে—হরেক কিস্‌মের দৌলত পাঠালে—হীরা মতি- পান্না সোনে রূপা, তখন রূপমতী বাঈ জওহরের 'শরবত পিয়ে' শুয়ে আছে—চোখের পাতা জুড়ে আসছে। সে সময়েও এই খেলাত দেখে তার মুখ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, বলেছিল—'হঠাও—পায়ের কি পয়জার মারকে হঠাও।'

শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা শিকোর নাম তো নিশ্চয় জান বাবুজী। শাহজাদা দারা শিকো এমনি এক গন্ধর্বীর বেটীকে শুধু ভালই বাসেননি সাদী করেছিলেন—তার নাম ছিল 'রানাদিল'। দিল্লীর চাঁদনী চওকের পাশে বাঈমহল্লার এক ছোটিসে গলিতে থাকত; তার

ভাই ঢোলক বাজাত—তার মা সঙ্গে থাকত আর সে গান গেয়ে পথে নাচত। গান শেষ করে লোকের কাছে সালামত জানিয়ে তার ওড়নার আঁচল মেলে ধরত—"মেহেরবানি হো যায় আমীর!"

শাহজাদা দারা শিকো তার রূপ দেখে তার গান শুনে দেওয়ানা হয়ে গেলেন। রানাদিলের খোঁজে পাঠালেন তাঁর বিশ্বাসী আদমীকে। নোকর সে—তলবানা সে নেয় কিন্তু শাহজাদাকে সে মনিব ভাবে না ভাবে আরও কিছু—ভাবে ফেরিস্তা ভাবে দেবদূত—দেবতার অংশ। —নিয়ে এস ওই রানাদিলকে—আমি এক রাত্রির জন্য তাকে ওজন করে আশরফি দেব।

রানাদিল গন্ধর্বীর মেয়ে। সে বলেছিল—আমি নাচি গান করি —পথের উপর নাচি—মানুষের পায়ের ধুলো আমার গায়ে লাগে —দৃষ্টি দিয়ে তারা আমাকে ভোগ করে তবু আমি ভোগ্যা নই। আমি ভোগ্যা তারই যে আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে। আমি পরস্তার হব না বাঁদী হব না—আমি হতে হলে রানী হব নয় বেগম হব—কোন গৃহস্থের ঘরের বহুজী হব কোন মুসলমানের ঘরের বিবি হব কিন্তু সোনা রূপোর জন্যে নিজেকে বিক্রি করব না।

রানাদিলকে শাহজাদা দারা শিকো শেষ পর্যন্ত সাদী করেছিলেন। বিয়েতে বাদশাহ সাজাহানের হুকুম করাবার জন্যে শাহজাদা খানাপিনা বন্ধ করে মরব বলে সংকল্প করেছিলেন। বাদশাহ এক পথের নাচনে-বালীকে শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদার বেগমের অধিকার দিতে চাননি। কিন্তু গন্ধর্বী ব্রাহ্মণের মেয়ে টলেনি। শেষ পর্যন্ত হুকুম দিতে হয়েছিল বাদশাহকে।

গন্ধর্বী নাচনেবালী এই রানাদিল তার দাম দিয়েছিল। নিজের নাম রেখেছিল। বাবুজী, ঔরংজীব বাদশাকে গোঁড়া মোল্লা মৌলবীরা বলে জিন্দাপীর; আমীর ওমরাহরা বলত পাথরের কলিজাবালা মানুষ —সে দারা শিকোকে জহ্লাদের হাতে দিয়েছিল—সে তার মুণ্ডুটা

এনে 'সোনেকা থারিকে পর' রেখে সামনে রেখে দিয়েছিল। সে কাটা-মুণ্ডু দেখে ঔরংজীব একবার চোখ বন্ধ করেনি। শুধু পরখ করে দেখেছিল কাটামুণ্ডু কথা বলে কি না! সেই ঔরংজীব চেয়েছিল রানাদিলকে—বড়ভাইয়ের বেওয়াকে। ফিরিঙ্গী মেয়ে উদিপুরী বাঈ ঔরংজীবের পরস্তার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এক ডাকে। লেকিন রানাদিল না। সে বললে—কেন, আমাকে নিয়ে কি করবে নতুন বাদশা! বাদশা বলে পাঠালে—পিয়ার করব। তোমাকে ভারী ভাল লাগে। রানাদিল বলে পাঠালে—কি ভাল লাগে আমার? বাদশা বলে পাঠালে—তোমার ওই কাল রেশমের মত চুল। এমন চুল আমি দেখিনি। এ কথার উত্তরে রানাদিল তার সেই অপরূপ চুলের রাশি কেটে বাদশাহকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালে—এই চুল বাদশাহকে নজরানা পাঠালাম। বাদশাহ এবার বললে—শুধু কি চুল? ওই অপরূপ রূপ? শুনে রানাদিল ধারালো ছুরি দিয়ে মুখখানাকে ক্ষতবিক্ষত করে একখানা মসলিনে সেই ক্ষতের রক্ত মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বলে পাঠালে—এই রক্তের সঙ্গে আমার সব সৌন্দর্যকে বের করে দিয়েছি—আমার মুখ ক্ষতবিক্ষত—বাদশাহ দয়া করে আমার খুবসুরতির জৌলুসের কথা ভুলে যান। বাদশাহ ঔরংজীব হার মেনেছিল এই গন্ধর্বীর বেটীর কাছে।

বাবুজী, এদের ভালবাসা বারণ। মহব্বতে এদের অধিকার নেই। নিয়ম হল বাবুজী, এরা কুমারী থেকে গান-বাজনা করবে নাচবে; তুনিয়ার মানুষের দিল এরা নেবে কিন্তু নিজের দিল কাউকে দেবে না। সেই সঙ্গে দেবে না নিজের জওয়ানী। নিজের দেহ। কিন্তু তা হয় না বাবুজী—এদের দেহের জন্যে পুরুষমহলে কাড়াকাড়ি পড়ে। শয়তান এসে চুপিচুপি শল্লা দেয়—বেচো। সোনা রূপো জওহরত নাও—নিয়ে বেচো। রূপেয়া লেও রূপ বেচো—দৌলত লেকে দেহ বেচো। কিন্তু নিজেকে বেচো না। এই কারবারের

আড়ালে লুকিয়ে থাকে সে—সেই শয়তান! বামুনউলীর নট ব্রাহ্মণ পাড়ার আনাচেকানাচে গলিঘুচির মধ্যে বাসা ছিল এই জানবারের পায়ের মত পাওয়ালা কারবারীর; একটি গোপন আস্তানা ছিল বাবুজী। সেই গোপন গদিতে এই কারবারের শুরু হল।

তখন বামুনউলীতে এই গন্ধর্বীদের বাড়িতে এক অপরূপ সুরতবালী বেটী ছিল; সবে সে তখন কিশোরী। জওয়ানী তখনও তার পুবা হয়নি। জওয়ানী তখন তার সর্বাঙ্গে সবে সাড়া দিতে শুরু করেছে। তাকে তার মা তালিম দিচ্ছে গানে বাজনায় নাচে। এই মহল্লার গুরু ছিলেন এক ফকীর। গানবাজনায় এরা ছিল এই ফকীরের ঘরওয়ানা। গজল থেকে ভজন সব তিনি শেখাতেন। বড় বড় তাল মান সেও ছিল তাঁর বিশেষ ঢঙের। ফকীর পাঁচবক্ত নামাজ পড়তেন আবার ভজন গেয়ে মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগরকেও বন্দনা করতেন। গ্রামের শুদ্ধ ব্রাহ্মণরাও ফকীরকে খাতির করতেন, কোন ঝগড়া ছিল না। শিউজীর মন্দিরের বাইরে দাওয়ায় বসে ফকীরসাহেব গান করতেন আর ওই পুরোহিতজী সঙ্গত করতেন; বেবাক গাঁওয়ের লোক বসে শুনত সারারাত।

বাবুজী, এই ফকীর আমার গুরুর গুরু। খুদাতায়লার ধ্যানে জপে মশগুল মানুষ—পয়গম্বর রসুলের খাদিম, তবু মোল্লা মৌলভীরা তাঁকে বলত ভ্রষ্ট ফকীর। শাহানশাহ জালালুদ্দিন আকবরশাহকে যারা বলত দজ্জাল এরা তারাই—এরা এই ফকীর-সাহেবকে বলত ভ্রষ্ট।

তা বলুক বাবুজী, আমার গুরুর গুরু এই ফকীরসাহেব যখন গালে বাঁ হাত রেখে ডান হাত আকাশের দিকে তুলে 'খোদা মেহেরবান' বলে তান ছাড়তেন তখন সে তান নিশ্চয় গিয়ে পৌঁছুত খুদার দরবারে। মীরার ভজনও যখন তিনি গাইতেন—যখন 'প্রভুজী'

বলে সুরে তিনি ভজন ধরে ডাকতেন তখন পত্থলের প্রভুজীর মুখও যেন ঝকমক করে উঠত। রহিমশাহ ছিলেন সিদ্ধ ফকীর—তামাম লোকে তাঁকে বলত মুনিস্‌উল-আরওয়া (আত্মার সান্ত্বনাদাতা)—এই গন্ধর্বীদের আর মুসলমান বাঈদের তিনি পীর ছিলেন। হিন্দুস্তানের বাঈ আর গন্ধর্বীদের বড় বড় যারা তারা সবাই ছিল তাঁর 'মুরিদা'।

বাবুজী, এই লেড়কী এই কিশোরী শক্করবাঈ গুলবদ্‌নী সেও তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। ধর্মেও বটে সংগীত-শাস্ত্রেও বটে। তার মায়েব নাম ছিল চন্দ্রমুখী। সেও ছিল খুব কলাকী মেয়ে। একজনকে ভজেই তাব জীবন। গুরু বহিমশাহের ভরসা ছিল এই মায়াবতীর গানে একদিন খুদাতায়লার দয়া নিয়ে ফিরিস্তাকে আসতে হবে। পয়গম্বর রসুল মহম্মদ আশীর্বাদ করবেন।

এই চৌদ্দবছরের মেয়েটির ডাকনাম ছিল 'শক্কব'। মানে বোঝো তো বাবুজী? বাঙ্গালীরা তোমরা 'চিনি' বল। মানে মেয়েটা আগাগোড়া মিঠা। তার মধ্যে ওই মিঠারস ছাড়া বিছু নেই। আব ভাল নাম 'গুলবদ্‌নী'। এ নিশ্চয় বোঝো। গোলাপবদনী! হাঁ বাবুজী গুলাবের মতই ছিল সে। তেমনি বঙ তেমনি নবম। গুরু বলতেন মায়াবতী।

(চার)

এগারশো পঁচাশী হিজরার পর। হয়তো দু এক বছর পর হতে পারে। বাবুজী, বাদশাহ শাহ আলমের ফৌজ তখন বাদশাহী হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে—মির্জা নজফ আলি বাদশাহী হুকুমৎ পেলেই রোহিলখণ্ড আক্রমণের জন্য রওনা হবে।

রোহিলখণ্ডে নবাব জবিতা খাঁ—রোহিলা নবাব—খান-ই-খানান

নাজিবউদ্দৌলার পুত্র এবং সারা রোহিলখণ্ডের রোহিলা পাঠান আমীর এবং নবাবদের মধ্যে প্রধান—তার বিরুদ্ধে হবে অভিযান ।।

বাদশাহ শাহ আলম প্রাণপণে নিজেকে দমন করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখবেন। অনেক দেখেছেন তিনি—আরও একবার দেখবেন। না দেখে তাঁর উপায় নেই। বাদশাহ জানেন তাঁর বাদশাহীর শক্তি কত। হয় রোহিলা নয় মারাঠা নয় অযোধ্যার নবাব নয় জাঠ—এই চার যষ্টির কোন একটা যষ্টি ছাড়া দিল্লীর বাদশাহীর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

পানিপথে আফগান বাদশাহ আবদালী সারা দেশের বুকে আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে—লুঠ করে ফকীর করে দিয়ে গেছে—খুন করে সারা দেশের মাটি রাঙা করে দিয়ে গেছে। দিল্লীর বাদশাহের উজীরি দাবি করে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা লক্ষ্মৌয়ে নবাবী করছে।

নিজেকে দিল্লীর বাদশাহের মীরবক্সী সিপাহসালার বলে ঘোষণা করে নবাব নাজিবউদ্দৌলার ছেলে এই জবিতা খাঁ রোহিলখণ্ডে নাজিবাবাদ, ঘাউসগড় পাথ্থলগড়, জেলা সাহারানপুর, জেলা জালালাবাদ থানা ভাওয়ান লুহারী নিয়ে সমস্ত মুল্লুকটা দখল করে বসে আছে। আবদালী যখন দিল্লীতে এসে দিল্লী মথুরা জাঠদের বল্লভগড় পর্যন্ত তামাম এলাকা লুঠ করে নিয়ে যায় তখন নাজিবউদ্দৌলা সে লুঠে ভাগ বসিয়ে সম্পদ জমা করেছে তার তিন চার গড়ের মধ্যে। গড় নাজিবাবাদ ঘাউসগড় পাথ্থলগড়ের এলাকায় সে চেপে বসে তার এলাকাকে আলিগড় মীরাট পর্যন্ত বিস্তৃত করে রেখেছে।।

শুধু দেশ লুঠ করা সম্পদ নয়, এই দিল্লীর বাদশাহী মহল লুঠ করা দৌলতে নিয়ে সে তার দরবার সাজিয়েছে। বাদশাহের মনে পড়ে আহমদশাহ আবদালী তাঁকে শাহজাদা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সুবাদারদের কাছে বাকী খাজানা আদায়ের জন্য। তিনি অযোধ্যার

নবাবের সঙ্গে বাংলা মুলুকের জন্য লড়তে গিয়ে বক্সারে ফিরিঙ্গীর কাছে হেরেও শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন। দশ বৎসর দিল্লী ফিরতে পারেননি। পারেননি এই জবিতা খানের জন্য।

শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে দিল্লী ফিরেছেন ফিরিঙ্গী আর বর্গীদের সাহায্য নিয়ে। জবিতা খাঁ পালিয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত সে তার বাপের মৃত্যুর দরুন খারিজান নজরানা দেয়নি খাজানা দেয়নি। একবার একটা সুলেনামা করে সে নিয়েছিল; তারই শর্ত অনুযায়ী তার ছেলে গোলাম কাদেরকে জিম্মা রেখেছে সে বাদশাহের দরবারে। তবু সে তার শর্ত পালন করেনি। খাজানা দেয়নি। নজরানা দেয়নি।

এবার উজীরের স্বনাভিষিক্ত আবহুল ওহাদ তার ভাই আবহুল কাসিমকে পাঠিয়েছিল ফৌজ সঙ্গে দিয়ে বাদশাহী খাস তালুক যা নাজিবউদ্দৌলার সময় থেকে ভোগ করে আসছে তাই জবিতা খাঁর হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু জবিতা খাঁ জিতেছে, আবহুল কাসিম লড়াইয়ে হেরেছে মরেছে। তাব দেহ নিয়ে এসেছে বাদশাহী সিপাহীরা। কবর হয়ে গেছে। আবহুল ওহাদ লোক পাঠিয়েছে শেষবার জবিতা খাঁয়ের কাছে। শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে জবিতা খাঁকে। তোমার ছেলে আছে এখানে জিম্মাদারিতে। হুঁশিয়ার!

গোটা মুল্লুকটার হাওয়া থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝড় উঠবে উঠবে মনে হচ্ছে।

তবে ঝড় আর নেই কখন নেই কবে? সেই নাদিরশাহের পর থেকে একাল পর্যন্ত আজ কমপক্ষে পুরা চালিশ বরিষ চলেছে একটানা একটা কাল যার মধ্যে ঝড় ছাড়া দিন নেই। যুদ্ধ নেই লুঠতরাজ নেই খুনখারাবী কবে নেই? বলো কবে নেই?

বামুনউলীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গন্ধর্বপাড়ার কুঁইয়া: অনেক কালের পুরানো কুঁইয়া। বামুনউলীর এক নটী মেয়ে ছিল অমৃত-

কুমারী ; সে সেই ফরুকশের বাদশাহের সময় সৈয়দ ভাইয়াদের আমল ; ঠিক জাহান্দারশাহী আর লালকুয়রের আমলের পর। অমৃত্‌কুমারী দিল্লীতে গিয়েছিল এই বাম্‌নউলীর এই পাড়া থেকেই। আর দশ বছর মাত্র বেঁচে ছিল—তার মধ্যে রোজগার করেছিল রাজার ঐশ্চর্য। নবাবের দৌলত। তখন দেশে অঢেল দৌলত। নাদিরশাহ তখনও সোনা রূপা হীরা জহরতে শ'য়ে শ'য়ে অনেক শ'ও ক্রোড় টাকা লুটে নিয়ে যায়নি ; আহ্‌মদশাহ আবদালী চার চার বার লুট করে আরও শও শও ক্রোড় নিয়ে যায় নি। তখনও দৌলতওয়ালা মানুষেরা লুটের ভয়ে মাটির তলায় কুয়োর মতন গভীর গুপ্ত ধনাগার বানিয়ে তার মধ্যে রেখে পাথর চাপা দেয়নি। জাঠ গুজর ডাকাতেরা তখন শের না-থাকা জঙ্গলের বেপরওয়া নেকড়েব দলেব মত ছুটে ছুটে বেড়াতো না।

অমৃত্‌কুমারী লাখো লাখো টাকা রোজগার করে গাঁয়ে কীর্তি করেছিল ; এই কুয়ো প্রতিষ্ঠা করেছিল এই পাড়ায় : আরও দুটো কুয়ো করেছিল আর দুই পাড়ায়—একটা শুদ্ধ ব্রাহ্মণপাড়ায় আব একটা আর সব জাতের জন্যে। আর ওই যে কুয়োর সামনে শিউজীকে মন্দির—পাথরের মন্দির, ও মন্দিরও করে দিয়েছিল অমৃত্‌কুমারী। শিউজীর নামই হয়ে গেছে 'অমৃতেশ্বর'।

অমৃত্‌কুমারী জমি কিনে দিয়ে গেছে শিউজীর সেবা পূজার জন্যে ; ওপাড়া থেকে পুরোহিত ব্রাহমণ মহারাজ রোজ ভোরবেলা আস্নান করে তিলক কেটে বেলপাতা আর ফুল, আতপচাল আর গঙ্গাবারি নিয়ে এসে বম-বম ধ্বনি তুলে মন্ত্র পড়ে গাল বাজিয়ে পূজা করে যান। গন্ধর্বীপাড়ার যারা বুড়া হয়েছে বুড়ী হয়েছে তাদেরও দু চারজন এসে ঘরে ঢুকে দু চারটে বেলপাতা চাপিয়ে যায়। বাকীরা সব প্রণাম করে।

গান্ধর্বী মেয়েদের মধ্যে যারা পুণ্যবতী যারা ভাগ্যবতী· যারা

জন্মান্তরের পুণ্য নিয়েই জন্মায় তাদেরই এমন সৌভাগ্য হয়। তারাই, গন্ধর্ববিদ্যা—নাচ গানবাজনা—তার দৌলতে রোজগার করে মন্দির গড়ে ভগবানকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে যায়, আপনজন মানুষদের কল্যাণে কুয়া প্রতিষ্ঠা করে জলদান করে। পথের ধারে মাঠের মধ্যে গাছ প্রতিষ্ঠা করে ছায়াদান করে। অমৃত্‌কুমারীর বহুৎ পুণ্য। বহুৎ নাম।

গুলবদ্‌নীর সম্পর্কেও সেই আশাই করে গন্ধর্বীপাড়ার লোক। ব্রাহ্মণপাড়ার পুরোহিত মহারাজ বলেন—দেবীর মত ললাট! মসৃণ, টাটকা ফোটা গোলাপের পাঁপড়ির মত। সেদিন বেশ ভাল করে দেখে বৃদ্ধ পুরোহিত বলেছিলেন—শঙ্কর, তোর ওই দুর্লভ দেহের বাগিচায় এবার যে বসন্তবাহারের খরতাই এল রে! শীসাতে নিজের মুখখানা দেখিস?

শঙ্কর মুচকে মুচকে হেসেছিল।

মহারাজ বলেছিলেন—দেখ্ শিউজীর পায়ের তলায় আস্নান করে একটা ত্রিপত্র ফেলে দিস নমঃ শিবায় বলে। হাঁ! বলিস ভগবান দেখো তোমার কপালের আগুন যেন ধ্বক করে জ্বলে না ওঠে। আঁ?

মনে মনে মহারাজ আরও কিছুটা বলেছিলেন—বলেছিলেন যেন তোর দেহের এই বসন্তবাহারকে সে আগুনে পুড়িয়ে ছাই না করে দেয়।

* * *

থাক বাবুজী! সেদিন বাম্‌নউলীর গন্ধর্বীপাড়ার ওই শিব-মন্দিরের সামনে কুয়োতলায় জল নেবার জন্যে এসেছিল যত যুবতী মেয়েরা। পরনে নানান রঙের ঘাঘরা আর চুস্ত পাজামা তার উপর ওড়না; একহাত করে রূপার সে আমলের মোটা মোটা ঢঙের গহনা, গলায় হাঁসুলী আর কণ্ঠী, নাকে বেসর নথ, পায়ে এক এক গোছা সরু মোটা মল। মাথায় কাপড়ের বিঁড়ের উপর কলসী। কেউ

চাপিয়েছে ভর্তি করে; কেউ খালি কলসী নামিয়ে ভর্তি করে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। যারা চলে যাচ্ছে তারা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষা করে তারা গল্প করছে; গল্প একটাই নয়, দুজনে মিলে এক একটা গল্প এবং আলোচনা।

আলোচনা করছিল বুড়ীরা বয়স্করা—বামুনপাড়ার পাণ্ডেজী ফিরেছে কাল মীরাট থেকে। বাদশাহী ফৌজ তৈয়ার। তারা ঘাউস-গড় পাথলগড়ের উপর হামলা করবে—ভারী ভারী তোপ নিয়ে আসছে বাদশাহের মীরবক্সী মিরজা নজফ। আগ্রার দিক থেকে আসছে সিন্ধিয়ার বর্গী সওয়ারের দল। দরকার হলে তোপ দেগে উড়িয়ে দেবে ঘাউসগড়। মজলিস বসেছে বর্গী সওয়ারদের জুলুম থেকে বাঁচব কি করে? রোহিলাদের উপর তাদের ভারী রাগ।

হাঁ হাঁ। পানিপথের লড়াইয়ের সময় ভাওসাহেবের তাঁবু লুঠ করে তাদের জেনানাদের এনে কলমা পড়িয়েছে। তারা তো বেঁচে আছে।

—তা নিয়ে আমাদের কি? আমরা রোহিলা পাঠানও নই—আমরা কোন জন্মে পল্টনে কাজ করিনি। আমরা নটী গন্ধর্বী।—তাছাড়া ভাওসাহেবের তাঁবু লুটে জেনানী লুটেছে সে কমসে কম বারো বরিষ; পুরা যুগ হয়ে গেছে। এর মধ্যে কবার যে নাজিবউদ্দৌলা আর জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে তার ঠিক আছে? দূর দূর।

—তবে তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও!

—তা ছাড়া কি? আর হয়ই যদি, করব কি? আজ দাঙ্গা কাল লড়াই—পরশু ফিন লড়াই—তারপরদিন বাদ দিয়ে ফের আবার। মানুষ মরেও শেষ হয় না, মানুষ মারাও ছাড়তে পারে না মানুষ। বেশ তো মারুক। মরব। তা নিয়ে ডর করব কত?

—তবে তুমি নাচো।

—নাচবই তো। আন না ঘুঙুর আন, নেচে দেখিয়ে দি! বলে সে বুড়ী সত্যিই গান ধরে দিল—মরতেই যদি হয় লো সখী তবে পেট ভরে পকৌড়ি খেয়ে নি আয়। আর সারা রাত জেগে আমার জোয়ানের বুকখানা আঁকড়ে ধবে পড়ে থাকি। কেউ তোরা ডাকিসনে। কেউ তোবা বকিসনে। বলিসনে আমি বেশরমী! বলিস তো বলগে যা—আমি তাই আমি বেশরমী। আমার জোওয়ান—তুমি ঢোলক বাজাও আমি নাচি ঝমর ঝমর করে। ভাল না লাগে তো এই ঘাসের উপরেই তুমি শুয়ে পড়ো আমি তোমার বুকের উপর ঝাপিয়ে পড়ি বিলেব জলের বুকে হাঁসের মত।

সমস্ত দলটিই সরস কৌতুকে কিছুটা উচ্ছল হয়ে উঠল। গায়িকা প্রৌঢ়া একসময় নটীগিরি কবে এসেছে, মীরাট শহরে ছিল সে, একবার সে বৃন্দাবন গিয়েছিল জাঠরাজা রতন সিংয়েব নিমন্ত্রণে—সেখানে ব্রজমণ্ডলের রাজা সেজে রতন সিং চার হাজার নটী নাচবালী নিয়ে রাসমণ্ডল করেছিল। সে পোশাক পেয়েছিল, ঝুটা মতির মালা পেয়েছিল, তা ছাড়া চাঁদির টাকা সিকা দু মুঠো পেয়েছিল দু হাতে—তাতে পঞ্চাশ টাকার উপর হয়েছিল।

হঠাৎ একজন বলে উঠল—দেখ দেখ! ধুলো উড়ছে দেখ!

সকলেই চকিত হয়ে ফিরে তাকাল—ঘোড়সওয়ার! ধুলোয় ঝড় উড়িয়ে আসছে! দেখেছ?

—হ্যাঁ। বহু জোর ছুটেছে ঘোড়াটা। আরে বাপরে—!

—এমন কবে কেন ছুটছে বল তো? এত জোরে?

—নওজোয়ান। মরণের পরওয়া নাই। ছুটেই আরাম।

এক বুড়ী কিন্তু বললে—নেহি।

—নেহি? তো কিস লিয়ে—কহো?

—জান বাচানে কো লিয়ে। মরণে নেহি মাংতা!

—কিন্তু কি হল বল তো ?

—কি হল ?

—কই ধুলোর ঝড় ওড়ানো সওয়ার কই ?

—ওই তো ঘোড়া—

—হ্যাঁ। ঘোড়া তো বটে। কিন্তু সওয়ার কই ?—

একটা সওয়ারহীন ঘোড়া দুরন্তবেগে ছার্তক চালে ধুলো উড়িয়ে চলে আসছে—এই আসছে—এই আসছে। কিন্তু সওয়ার কই ?

—সওয়ার পড়ে গেছে—হয়তো মরে গেছে।

—ওই দেখ আবার ধুলো—ওই দেখ এবার ধুলো কত ! ও হোঃ। এ যে অনেক।

—এক দল সওয়ার।

—পল্টন। চল্ চল্ ঘর চল্।

ছুটল মেয়েরা ঘরের পানে। ছুটে এসে গ্রামে ঢুকে কলরব তুললে। পুরুষেরা কয়েকজন এসে গ্রামের বাইরে দাঁড়াল। তাদের পিছনে পুরুষেরা এদিকে ওদিকে লুকিয়ে রইল। মেয়েরা গ্রামের উল্টো দিকে পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে আখের খেতির মধ্যে লুকিয়ে রইল। গঁহুর সময় ক্ষেতভরা গঁহুর মধ্যে লুকোনো বিপদ। সরষের ক্ষেত তা থেকে ভাল। সরষের মুল্লুক। দেখতে দেখতে গ্রামটাকে গ্রামটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় এক ঘড়ি বাদ নাকাড়া বাজল। বিপদ কেটে গেছে। মেয়েরা ফসলভরা ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এল।

—কি খবর ?

—বাদশাহী ফৌজ খুঁজে বেড়াচ্ছে রোহিলা নবাব জবিতা খাঁয়ের বেটাকে ; গোলাম কাদের তার নাম, ষোলা বরিষ এমনি উমর ; সে বাদশাহের কাজে নবাবের তরফ থেকে জিম্মা হয়ে ছিল। জবিতা

খাঁয়ের সঙ্গে লড়াই বাধে বাধে। গোলাম কাদের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালিয়ে এসেছে বাদশাহী ছাউনি থেকে।

—আ!

—তাহলে ওই ঘোড়াটা সেই গোলাম কাদেরের! কিন্তু সে কোথায় গেল?

—তাকে খুঁজছে। তাই পিছনে চলে গেল বাদশাহী সিপাহীরা।

—খুঁজলেই পাবে। কোথাও হাত পা ভেঙে জখম হয়ে পড়ে আছে!

—হয়তো মরেই গেছে!

—কিন্তু তোর হল কি শঙ্কর?

কিশোরী শঙ্কর যেন কেমন হয়ে গেছে। গোলাপের মত রঙ তার যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে যেন কি ফুটে উঠেছে।

(পাঁচ)

শঙ্কর একখানা ঘন-ফসল-ভরা ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছিল। বাইরে আগন্তুক সওয়ারদের হল্লা যত বেড়েছিল ততই একদল মেয়ে ভয়ে ফসলের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করেছিল কোন একটি নিরাপদ গভীরে খুব গোপনীয়তার মধ্যে।

বাবুজী, তখনকার দিনে ঔরতের কাছে সিপাহী মানেই বেইজ্জতি; তবে সে আমলে ঔরৎরা এ জুলুমবাজি সহ্য করেছে কিন্তু হার মানেনি। বাবুজী, আমেদশা আবদালী যখন আসে সেই আমলে পাঞ্জাবে ছিল একজন সুবাদার—সে আড়াইশো তিনশো পাঞ্জাবী শিখ হিন্দু তার সঙ্গে দু চারজন মুসলমান ঔরৎ ধরে এনে কয়েদ করে রেখেছিল; তাদের দিয়ে কয়েদীদের মত চাকিতে গম ভাঙাতো ডাল ভাঙাতো—ভারী ভারী কাম করিয়ে

নিত—আবার ইচ্ছে হলে তাদের উপর জবরদস্তি জানওয়ার কামও চালাতো। বলেছিল—ধরম ছাড়লে রেহাই; সব মেয়ের ভাল ঘরে সাদী করিয়ে দেবে। কিন্তু তারা তা করেনি। গম পিষে ডাল ভেঙে দেহের উপর জবরদস্তি সহ্য করেও তারা কয়েদী হয়েই ছিল কম দিন নয়—ছ' মাস আট মাস। তারপর একদিন তাদের মর্দানারা নাঙ্গা তরোয়াল আর বর্শা নিয়ে এল—সুবাদারকে তখন পেট চিরে মেরে ফেলেছে। এসে সব মেয়েকে খুলে দিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারা গরুর নাম নিয়ে একটা উপোষ করে গঙ্গাজীমে আস্নান করে নিলে; বাস হয়ে গেল; কোন পাপ নাই কোন গ্লানি নাই। এ সেই আমল বাবুসাহেব।' মেয়েরা বেইজ্জতির ভয় করে তবু তাদের সাহস আছে—লড়তেও পারে মরতেও পারে। রোহিলা-দেরই মেয়ে—সর্দার হাফিজ রহমতের এক বেটীকে লুটে নিয়ে গিয়েছিল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। সে বেটী নবাবকে বুকে ছুরি মেরে নিজেও মরেছিল। ছুরিতে বিষ ছিল—নবাবের সারা দেহ পচে পচে খসে গিয়ে তবে মরেছিল।

ওঁরাওরা সে-কালে ভয়ও খুব করত না। তারা অনেকে ফসলের নীচে লুকিয়েও ফসল ফাঁক করে দেখতেও চেষ্টা করছিল—কি হচ্ছে। সতর্ক হয়ে কান পেতে শুনতেও চেষ্টা করেছিল, হাল্লার মধ্যে কি কথাগুলি ধ্বনিত হচ্ছে! শঙ্কর মিষ্টি মেয়ে—শঙ্কর ফুলের মত নরমও বটে কিন্তু একটা আশ্চর্য সরল সাহস আছে শঙ্করের। বেশ সহজভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্নাতুর ভ্রূ তুলে বলতে পারে—কেন? কেন এমন অন্যায় করবে? কেন? গায়ে জোর আছে বলে?

উত্তরে, তার মুখোমুখি দুর্দান্ত ভয়ংকর কেউ, 'হ্যাঁ' বললেও সে দমে না।

তাতে সেই চিরন্তন—কেন? বাঃ তা কেন হবে? গায়ে জোর

আছে বলে অন্যায় তুমি করবে নাকি—এমন প্রশ্ন বা এমন কথাও সে বলতে পারে। তার উপর কিশোরী বয়স। চৌদ্দ পার হচ্ছে—পনেরোতে পড়েছে; চপলতা এ বয়সের ধর্ম। একে এই দেশ, যে দেশে বারো-বছরের মেয়ে সন্তানবতী হয়—তার উপর নটী গন্ধর্বীর ঘরে ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল সুন্দরী মেয়ে, সে মনের দিক থেকে বেড়েছেও একটু বেশী। এবং আদরে একটু বেশী আবদেরে এবং প্রগল্‌ভাও হয়ে উঠেছে। সেই প্রগল্‌ভতার সঙ্গে একটি দুঃসাহসিকতা বর্ষা ঋতুর রৌদ্রের টানে মেঘের মত এসে জীবনের আকাশময় ঘোরাফেরা করে, সময়মত ঘনঘটারও সৃষ্টি করে। এই রূপসী দুঃসাহসিনী মেয়েটি সব থেকে এক প্রান্তের অর্থাৎ পথের দিকের একখানা জমির মধ্যে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্ষেতের আলের দিকে। সেখান থেকে দেখবে কি হচ্ছে। ফসলের মধ্যেই জমিতে শুয়ে ফসলের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করবে।

তখন হল্লা উঠছিল খুব। মনে হচ্ছিল গ্রাম থেকে সওয়ারেরা বেরিয়ে এই সব ক্ষেত ঘেরাও করতেই আসছে। ক্ষেত ঘেরাও করে তাড়া দিয়ে তাদের জানোয়ারের মত নির্যাতন করবে।

* * *

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—বাবুজী, তোমরা কিতাব পড়েছ। শুনেছি কিতাবে আজকাল সে আমলের বিলকুল সবকুছ খবর পুরা ঠিক ঠিক ছাপা হয়েছে। আজমীঢ়ে আমাদের আস্তানা—এক মুসলমান উলেমা কালিজে ভারী চাকরী করে। সে বলেছিল সে আমলে আবদালী যখন এসেছিল তখন আবদালী নিজে বাদশাহের হারেম থেকে পাঁচ সাত শাহজাদী নিয়ে গিয়েছিল—তার সঙ্গে বাঁদী গিয়েছিল শও দুই শও। আর সিপাহীরা দড়ি দিয়ে বেঁধে বকরী কি গাইয়ার মত নিয়ে গিয়েছিল এ দেশের আওরত। পথে তারা এক একটা করে মরত আর সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা এগিয়ে

যেত। দিল্লী থেকে আটক পর্যন্ত পথের দু'ধারে শুধু জমেছিল হাড্ডি—তার মধ্যে জানোয়ারের মানে ঘোড়া উট বয়েল খচ্চরের চেয়ে মানুষের হাড় বেশী—মানুষের হাড়ের মধ্যে আবার ঔরতের হাড় বেশী।

সেইজন্যে হল্লা শুনে ক্ষেতির ফসলের মধ্যে বড় বড় বাগিচার মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঔরতেরা ভয় পেয়েছিল বেশী, তারা হল্লার সঙ্গে সঙ্গে ওই ফসল কি জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে দূরে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছিল।

দু চারজন বুড়ী যাদের সাহস আছে তারা এবং তার সঙ্গে ওই কিশোরী মেয়েটি এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ক্ষেতের শেষ প্রান্তের দিকে, যেখান থেকে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে কি ঘটছে।

শঙ্কর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সন্তর্পণে নিঃশব্দে। হঠাৎ তার কানে এল একটু শব্দ। কাতরানির শব্দ। কেউ যেন কাতরাচ্ছে। কান পেতে শুনে সে বুঝতে চেষ্টা করেছিল।

না। জন্তুজানোয়ারের কাতরানি নয়।

মানুষের। হ্যাঁ মানুষের কাতরানি।

স্থির হয়ে সে সেইখানেই হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদের মত অপেক্ষা করে থেকেছিল। শুধু ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছিল শব্দটা কোন্ দিকে উঠছে। পিছন দিক সম্পর্কে সে খানিকটা নিশ্চিন্তই ছিল কারণ সেই দিক থেকেই সে এসেছে। শব্দটা মধ্যে মধ্যে উঠছিল—সর্বক্ষণ নয়। সম্ভবতঃ কোন আহত স্থানে নতুন করে কোন কিছুর সংঘর্ষ হলেই তখনই শব্দটা আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল এবং আধখানা বের হতে হতে চুপ হয়ে যাচ্ছিল। সামনের দিকেই যেন ঘন সরষের গাছগুলি দুলছে। হ্যাঁ। সামনের দিক থেকেই!

হঠাৎ একসময় ঠিক সামনাসামনি অল্প খানিকটা দূরে ওই সরষে-

গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়েই নজরে পড়েছিল একটি মানুষের দুটো হাত, মুখখানার খানিকটা। এলোমেলো পিঙ্গল চুল, রক্তাক্ত কপাল, দুটি আশ্চর্য চোখ। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তারা দুটি পিঙ্গলাভ, সে চোখ দুটোতে যত ভয়, ভয়-চাপা মরিয়া বুকের সাহস তত; সেই পরিমাণে আরও অনেক কিছু।

হঠাৎ তার চোখ পড়েছিল শঙ্করের দিকে, একটা চকিত চমক খেলে গিয়েছিল চোখের দৃষ্টিতে; ঠিক যেমন ভাবে একটা দমকা বাতাসে আলোর শিখা চমকে উঠে কেঁপে ওঠে তেমনিভাবেই কেঁপে উঠে আবার স্থির নিষ্পলক হয়ে উঠেছিল। সে দৃষ্টিতে সংশয় ছিল প্রশ্ন ছিল ক্রোধ ছিল ভয়ও ছিল।

চমকে শঙ্করও উঠেছিল। প্রথমটা সন্দেহের মধ্যেও ধারণা হয়েছিল ও দিককার আগন্তুক এই গ্রামেরই কেউ। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যাবে। সংশয়ের মধ্যে এ কৌতুকের প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু এ যে অপরিচিত একজন পুরুষ। তরুণ যুবা। এবং সুপুরুষ; রূপ আছে; বেশভূষা ধুলো কাদায় ময়লা মলিন হলেও মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে অভিজাত ঘরের কেউ। তখনও গোলাম কাদেরের নাম শোনেনি। গলায় মুক্তার মালা রয়েছে। কপালে রক্ত ঝরছে। শঙ্কর স্থির হয়ে বসে রইল।

লোকটি কিছুক্ষণ তাকে দেখে যেন একটি প্রসন্ন আশ্বস্ততায় আশ্বস্ত এবং খানিকটা নির্ভয় হয়ে উঠল। সে এবার হাতজোড় করে একটু সকাতর হেসে মিনতি করে ঘাড় নাড়লে।

সে ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট—আমাকে বাঁচাও। আমাকে দয়া কর। আমাকে ধরিয়ে দিয়ো না।

নিজের অজ্ঞাতসারেই শঙ্করের মুখে একটি নীরব অভয়ের হাসি ফুটে উঠেছিল ঠোঁটে এবং ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল তার দৃষ্টির মধ্যে।

—নিশ্চিন্ত থাক। ভয় নেই। মা না না।

তার দৃষ্টির সম্মুখে তার ক্লিষ্ট কাতর আহত রক্তাক্ত মুখখানি সে দেখতে পাচ্ছিল। এ ছাড়া আর কোন্ উত্তর তার থাকতে পারত ?

বল বাবুজী! আর কোন্ জবাব শঙ্করের মুখে চোখে ঠোঁটের ভঙ্গিতে ভেসে উঠতে পারত ?

এর পরেও সে তার ডানহাতখানি তুলে বার দু তিন নেড়ে জানিয়েছিল—ভয় নেই। থাক থাক!

এবার চাপা গলায় একটি কথা বলেছিল সে—দোহাই তোমার! এই মুক্তার মালা—।

শঙ্করও চাপা গলায় বলছিল—না। খুদা কসম। কোন ভয় নেই তোমার!

* * *

বাদশাহী সিপাহীরা চলে গেলে সকলে যখন গ্রামে ফিরল এবং সমস্ত বিবরণ শুনলে তখন শঙ্কর বুঝতে পারলে না সে কি করবে! সে কি বলে দেবে? বলবে—সেই রোহিলা পাঠান নবাবের ছেলে যার নাম বলছ গোলাম কাদের—সেই পনের ষোল বছরের নওজোওয়ান ওই সরষের ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে আছে!

বুকের ভিতরটা কেমন করছিল।

ফকীর বলেছিলেন—বাবুজীসাহেব, তখনকার দিনে হিন্দু হোক মুসলমান হোক কেরেস্তান হোক, শহরবাসী হোক, গাঁইয়া হোক, পাহাড়িয়া হোক তারা দিল্লীর বাদশাকে বড় খাতির করত ভালবাসত। এক দক্ষিণ ছাড়া বাবুজী। হিন্দুস্তানের গঙ্গাজী যমুনাজীর দুই পাশে যে ইলাকা তাদের কাছে বাদশাহ ছিল দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। আকবর শাহের সময় থেকে এই কথা মানত হিন্দুরা—মুসলমানেরা বলত শাহ-ইন শাহ—সারা

দুনিয়ার বাদশা হিন্দুস্তানের বাদশা। সে খাতির বামনউলীর বালক বৃদ্ধ যুবা সবাই করত। বাদশাহের অনিষ্ট যাতে হয় তা করার নামই ছিল ইমান নষ্ট করা বে-ইমানি করা। বেইমানির মত বেধরম নাই।

শঙ্কর ভাবছিল—বেইমানি করবে সে? গুনাহগারীর দায় হবে তাব। বাচ্চা লেড়কী বাবুজী!

তার মুখের গুলাবের মত মিঠা রঙ ফ্যাক্যাসে হয়ে গিয়েছিল দুর্ভাবনায়।

বলেই বা দেবে কি করে সে? কানে যে এখনও বাজছে সে নিজে বলে এসেছে—খুদা কসম, কোন ভাবনা নেই তোমার।

এয় খোদা—! শঙ্কর কি করবে বলে দাও।

যদি ধরা পড়ে তাহলে হয়তো কোতল করবে তাকে। আ হা—পনের যোল বছরের নওজওয়ান—কি সুন্দর দেখতে! কচিবয়সের দেওদার গাছের মত; ছিপছিপে লম্বা—কি সুন্দর ঈষৎ পিঙ্গলাভ চুলগুলি—কি উজ্জ্বল দুটি তীক্ষ্ম চোখ!

এই সুন্দর নওলকিশোর—

ভজনগানের কলি মনে পড়েছিল তার—মীরাকে প্রভু গির্‌ধারী নাগর—!

ভাবতে ভাবতে চোখের কোল ভিজে উঠেছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছিল পুরোহিত মহারাজের কথা!

হ্যাঁ পুরোহিত মহারাজ তাকে বাৎলে দিতে পারবেন সে কি করবে!

সন্ধ্যাবেলা মহারাজ এসেছিলেন অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরে আরতি করতে।

আরতি শেষ করে মহারাজ শিউজীর মন্দিরের দরওয়াজা বন্ধ করছেন—যারা আরতি দেখতে এবং শিউজীকে প্রণাম করতে

এসেছিল তারা সকলে চলে গেছে ; আকাশে সেদিন তখন চাঁদ ছিল —শুক্লপক্ষ। মন্দিরের বাইরে বামনউলীর চাষের মাঠের ফসলের উপর এমন জ্যোৎস্না ছিল যে শীতের বাতাসে ক্ষেতভরা গম ও সরষের গাছগুলি দোল খাচ্ছিল তাও দেখতে পাচ্ছিলেন মহারাজ! পাশেই ছিল মন্দিরেরই একটা বাগিচা—তার মধ্যে ছিল ভাল কলমের পেয়ারার গাছ ; তার মধ্যে মহারাজ দেখতে পেলেন একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে আসছে। সম্ভবতঃ এতক্ষণ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল—গোড় লাগি মহারাজ বলে সে প্রণাম করলে।

সবিস্ময়ে মহারাজ বললেন—কে ? আরে ? তু—শক্কর ?

—জী হাঁ মহারাজ ! আমি শক্কর।

—তুই আমরুদের বাগিচার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলি ?

—হাঁ মহারাজ—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে লুকিয়ে ছিলাম।

হেসে মহারাজ বললেন—কেয়া ? তু রাধা প্যারী আর আমি বাঁশুরিয়া কৃষ্ণ কানাইয়া ? মহব্বতি ? আঁ ?

এই পিতামহের বয়সী রসিক পুরোহিত মহারাজ এই ধরনের রসিকতা করতেন এই গন্ধর্বীপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে। দু চারজন রূপসী নটী কন্যার সঙ্গে ছত্রি জমিদার সর্দার রাজার সঙ্গে গন্ধর্ব-বিবাহও তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত না কেউ তাঁর কথায়। শক্কর কাতর-কণ্ঠে বলেছিল—না মহারাজ—আমি যে বড় বিপদে পড়েছি। কি করব তুমি বলে দাও। বাতা দিজিয়ে মহারাজ, কি করব আমি ?

কেন, তোর আবার বিপদ কি হল ?

—বেইমানির গুনাহ থেকে বাঁচবার পথ আমাকে বলে দাও।

—বেইমানি—?

—হ্যাঁ মহারাজ !

সেই মন্দিরের দাওয়ার উপর বসে শঙ্কর সমস্ত কথা মহারাজকে খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছিল—বল, আমি কি করব ?

—তুই 'খুদা কসম' বলেছিস ?

—হাঁ জী মহারাজ !

—তাহলে তো তোকে সে কসম রাখতেই হবে রে।

ঠিক সেই সময়ে কিছুটা দূরে ক্ষেতের ফসলের ভিতর থেকে মাথা তুলে চারিদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে গোলাম কাদের উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শীতের কাল, সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির বুকে ধোঁয়ার মত বাষ্পপুঞ্জ জমতে থাকে—রাত্রির গাঢ়তার সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরের দিকে ওঠে। গোলাম কাদের সেই বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে যেন ঢেকেই যাচ্ছিল। তবুও তাকে দেখিয়ে শঙ্কর বলেছিল—ওই দেখ সে দাদাজী মহারাজ।

দাদাজী মহারাজ শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। গোলাম কাদেরকে দেখে বলেছিলেন—নবাবজাদা, এই লেড়কী তোমার কাছে খুদার নামে কসম খেয়ে বলেছে ভয় নেই তোমার। সে যখন বলেছে তখন আমিও বলছি। কিন্তু কতটুকু আমাদের জোর বল ? বামনৌলির আর কেউ তোমাকে দেখে খুশী হবে না। আমি বলি কি তুমি এবার চলে যাও এখান থেকে।

গোলাম কাদের বলেছিল—তাই আমি যাব। কিন্তু এই শীতেও আমার বড় তিয়াস পেয়েছে। পানি পিইতে চাই। আর ভুখা অনুভব করছি। কিছু খাদ্য দাও আমাকে! আর একটা ঘোড়া যোগাড় করে দাও। আমি দাম দিচ্ছি।

দাদাজী বলেছিলেন—সে হবে। আগে এস, ওই কুঁইয়ার ধারে এস। ওখানে পানি তুলে দেব—তুমি মুখ, হাত ধোও, সুস্থ

হও, শঙ্কর কিছু খাবার আমি তোকে দোব তুই নবাব-জাদা সাহেবকে এনে দিবি। খাওয়াবি। এর মধ্যে আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা একটা করছি। দাম তোমাকে লাগবে—কিছু বেশী লাগবে। মোহর হলে বিশ মোহর দাম লাগবে—আমাকে পাঁচ মোহর দিয়ো—সিক্কা রূপেয়া নেব না নবাবজাদা।

কুয়ো থেকে জল তুলে মহারাজ নিজে তাকে হাত মুখ ধুইয়ে কিছুটা জল পান করিয়ে, ওই শিউজীর মন্দিরের পাশের যে বাগিচায় গুলবদ্‌নী লুকিয়েছিল সেইখানে তাকে অপেক্ষা করতে বলে, গুলবদ্‌নীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবেন বলে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়ে নবাবজাদাকে ডেকে বলেছিলেন—নবাবজাদা, এক বাত তোমাকে আমি বলব। আর তার জবাবে তোমার কাছে চাইব তোমার জবান।

গোলাম কাদের বলেছিল—বল জী কি তোমার বাত। কি জবান তুমি আমার কাছে চাও?

—দেখ আমি গ্রামে গিয়ে এই শঙ্করকে দিয়ে তোমার জন্যে কিছু খাবার পাঠাব।

—তোমার মেহেরবানি চিরকাল মনে থাকবে আমার।

—না সাহেব। মেহেরবানি কিছু নয়। তুমি মুসাফের। তুমি বিপন্ন। তুমি ক্ষুধার্ত—তোমাকে সাহায্য করা তোমাকে খেতে দেওয়া মানুষের কাজ। গৃহস্থীর ধর্ম। কিন্তু এমন মুসাফের তুমি যে বাদশার সঙ্গে তোমার লড়াই চলছে। দিল্লীর বাদশার সঙ্গে যার দুশমনি তাকে আশ্রয় তো গ্রামে কেউ দেবে না। আমরা হিন্দু, রাজদ্রোহ আমাদের কাছে পাপ। কিন্তু শঙ্কর খুদার নামে কসম খেয়ে তোমাকে অভয় দিয়েছে। এখন বাত আমার এই যে আমি ঘোড়া আনতে যাব পাশের গাঁয়ে—আমার ভাইয়ের ঘোড়া আছে।

আর শক্কর আসবে তোমাকে খানা দিতে। এবার তোমার জবান আমি চাই নবাবজাদা কি কোন অনিষ্ট তুমি করবে না!

—অনিষ্ট? কি অনিষ্ট?

—কোন অনিষ্ট নবাবজাদা! যে কোন অনিষ্ট! এই লেড়কী আসবে তোমাকে খানা দিতে, একলা আসবে, বল তুমি—। জবান চাই তোমার। তোমরা নবাবের ছেলে রাজার ছেলে জমিদারের ছেলে—তোমাদের চৌদ্দ পনের বছর উমর হলেই বাপ মায়ে ছোকরী বাঁদী কিনে দেয়। শক্কর তা নয়।

পুরোহিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নবাবজাদা বলেছিল—দিলাম জবান!

—দিলাম জবান নয়। বল—জবান দিচ্ছি লেড়কীর কোন অনিষ্ট করব না!

—না। করব না।

—খুদা কসম।

—খুদা কসম।

—খুদা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ওই গাছতলায় ওই যে ছায়া পড়েছে ওইখানে অপেক্ষা কর। এখানে মহাদেব আস্তানে কারুর না আসারই কথা তবুও কেউ এসে পড়তে পারে।

শক্করকে মানে গুলবদ্‌নীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন পুরোহিতজী। বাড়িতে গিয়ে কয়েকখানা রুটি আর দুধ মিষ্টান্ন এই দিয়ে গুলবদ্‌নীকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—গন্ধর্বীর বেটী তুই শক্কর। চোদ্দ পনের বছরে গৃহস্থীঘরে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায়—ছেলের মা হয়। তুই সব বুঝিস। নবাবজাদা জমিদারের বেটা রাজার ছেলে আমীরের লেড়কা—এরা বড় লুচ্চা হয়। তুই কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে থাকবি।

গুলবদ্‌নী মাথা নীচু করে বলেছিল—হাঁ মহারাজ।

পুরোহিতজী যখন ঘোড়া নিয়ে ফিরেছিলেন তখন শীতের রাত দু পহর পার হয়ে গেছে; শুক্লপক্ষের চাঁদ তখন পশ্চিম দিগন্তে ডুবেছে—তার শেষ ছটাটুকুও ক্রমশঃ যেন কালো হয়ে আসছে।

অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের মাথার কলসগুলোও কালো হয়ে রাত্রির অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

পুরোহিত ডাকলেন—নবাবজাদা, সাহেব, জনাবআলি !

কেউ কোন উত্তর দিল না। অন্ধকার আকাশের মধ্যে যেন একটা সন্‌সন্‌ শব্দ উঠছে—সে শব্দ রাত্রিকালে ওঠে ; সম্ভবতঃ গাছপালার মধ্যে পত্রপল্লবের মৃদু আন্দোলনে এ শব্দের সৃষ্টি হয়। একটানা একটা সন্‌সন্‌ শব্দ ; মধ্যে মধ্যে এই শব্দকে চিরে বাদুড়ের ডাক এবং পাখার আন্দোলনের শব্দ ওঠে।

পুরোহিতজী কারও কোন সাড়া না পেয়ে যেন বিস্ময় এবং অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এমনি একটা উড়ে যাওয়া বাদুড়ের পাখার শব্দে এবং তার কর্কশ ডাকে সচকিত হয়ে নিজেকে ফিরে পেলেন। এবং উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলেন—

সা—হে—ব—জা—দা— ! জ—না—ব আলি ! তারপর ডাকলেন —শ—ঙ্ক—র ! শ—ঙ্ক—র !

চারিদিকে তখন ওই কুয়াশা মাটি থেকে মানুষের মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। কিছুই দেখা যায় না। ভয় হয়ে গেল পুরোহিতের। —হে শিউজী রক্‌সা কর প্রভু লেড়কীকে। হায় এ কি করেছে সে।

পরদিন সকালবেলা—বেলা তখন আধ প্রহর গড়িয়ে গেছে তখন খোঁজ পাওয়া গেল শঙ্করের।

শঙ্কর রক্তাক্তদেহে, খানিকটা দূরের একটা বাগিচার মধ্যে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিল।

কচি কুঁড়িধরা একটি সবুজ নরম লতাকে কেউ যেন থেঁতলে দিয়ে গেছে। ফকীর বলেছিলেন—বাবুজী, ফুলের মত লেড়কী একদম বেহোঁশ, সারা শরীরে কাপড়েচোপড়ে রক্ততে ধুলায় একেবারে যেন ছু হাত দিয়ে পাঁক মাখিয়ে দিয়েছিল।

(ছয়)

পশুর মত অত্যাচার করেই ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি। তার পাঁজরার পাশে একখানা ছোরা বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। বোঝা যায় মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। তবু মেয়েটার নসীব বাবুসাহেব—সে বাঁচল। ছোরাটা মেরেছিল কিন্তু কলেজা থেকে ছু তিন আঙ্গুল পাশে বসেছিল ছোরাটা, তাই শেষ পর্যন্ত যুঝে যুঝে কোনরকমে বেঁচে উঠল।

বাঁচালেন আমার গুরুর গুরু যাঁর কথা বলেছি তিনি। হজরত রহিমশাহ। গন্ধর্বী আর বাঈ তয়ফাবালীদের পীর। বাবুজী, শঙ্কর বেঁচে উঠে গুরুকে যা বললে তাই তোমাকে আমি বলছি। বিশ্বাস তুমি না কর না করবে। তাতে নিরাকার ঈশ্বরের মত যে দৃষ্টির অগোচর অদৃষ্ট বিচিত্র সত্য তা মিথ্যা হয়ে যাবে না।

শঙ্কর বাঁচল নসীবের জোরে আর রহিমশাহের মেহেরবানিতে তাঁর করুণায়। এ কথা বলেছি; কেন বলেছি শুনুন বাবুজী। আফজল আমাকে বলেছে আপনি সাচ্চা রইস আদমী; আপনি এটা বুঝবেন। ছুইয়ে ছুইয়ে চার হয় তিন একে চার হয় কিন্তু এক এক এক একে চার হয় এইটেই হল ঠিক হিসেব। এ বুঝবার মত এলেম থাকা চাই।

শঙ্করকে সকালবেলা পাওয়া গেল 'আধা কোশ' দূর এক

বাগিচার মধ্যে। লোকে তাকে নিয়ে এল ঘর। সারা গাঁওয়ের লোক ভেঙে এল। এ কি কাণ্ড! কোন্ শয়তান এমন জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ করে গেল?

পুরোহিত কোন কথা প্রকাশ করে বলতে পারেনি। দায় হবে তার। এত কাণ্ড ঘটবার পর বুঝতে পেরেছিল কতবড় ভুল সে করে ফেলেছে। সে ভুল খানিকটা শঙ্করের জন্যে মমতাবশে খানিকটা আবার দশখানা মোহরের জন্যেও বটে। সুতরাং ভুলের জায়গায় নিজের লোভের জন্য আপসোসের আর সীমা ছিল না তার।

নবাবজাদাকে সোজাসুজিই বলেছিল যে, ঘোড়া কিনে এনে সে দেবে—এই রাত্রেই দেবে কিন্তু দাম লাগবে বিশ মোহর; তা ছাড়া সে নেবে পাঁচ মোহর। বকশিস নয় মজুরি। আর তার মনে মনে ছিল—আর তাই সে নিয়েওছিল; আরও চার মোহর সে নিয়েছিল যার দশ মোহরের ঘোড়া বিশ মোহরে বেচে দিচ্ছিল তার কাছ থেকে। এই লোভটা তার মধ্যে বড় হয়ে না উঠলে সে কখনই সেই রাত্রে ঘোড়া কিনতে যেত না এবং শঙ্করকে ওই নবাবজাদার সামনে একলা যেতে দিত না। ব্যাপারটা চেপে গিয়ে সে বলেছিল—শঙ্কর তার বাড়ি এসে রাত্রে থাকবে বলেছিল—পণ্ডিতজীর কাছে মহাভারত শুনবার জন্যে প্রায়ই আসত; এক একদিন বুড়ী ব্রাহ্মণ দিদিয়ার কাছে কাহিনী শুনবার জন্য একটু পাশেই বিস্তারা বিছিয়ে শুতো। সেদিনও এসেছিল এবং কিছুক্ষণ পরই সে চলে গিয়েছিল—বলেছিল তার তবিয়ৎ আচ্ছা মালুম হচ্ছে না। সে ঘর যাচ্ছে। এর পর আর তো সে কিছু জানে না।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে বাবুজী এমন সময় বাম্‌নওলী গাঁয়ের শিউজীথানের দিক থেকেই গ্রামে এসে পৌঁছে গেলেন গন্ধর্বীদের গুরুজী আর হিন্দু মুসলমান সব লোকের আত্মার-

সান্ত্বনা-দাতা মুনিস্-উল-আরওয়া হজরতসাহেব। বলুন তো বাবুজী, রহিমশা কেন কি করে এলেন ওই দিনটিতে—ওই সকালটিতে? ফকীরসাহেবের শিষ্য অনেক—সারা রোহিলখণ্ড অযোধ্যা আবার এদিকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত ছড়ানো। আস্তানা তিনিই গেড়ে গিয়েছিলেন আজমীঢ়ে। এক মাহিনা দেড় মাহিনার কম তো আসাই হত না তাঁর—সময়-সময় দু মাহিনাও হয়ে যেত। বিশেষ করে বর্ষার সময় আর পুরা শীতের সময়। তাছাড়া দাঙ্গা লড়াই এ তো আছেই। সেবার এই ঘটনার মোট কুড়ি দিন আগে গুরু রহিমশাহ থেকে চলে গিয়েছেন, যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন ওই গুলবদ্নীকে—"বেটী, এবার আসতে আমার থোড়া দেরি হবে—তুমি যেন হুঁশিয়ারিব সঙ্গে যে রাগিণী দিয়ে গেলাম তা পুরা দুরস্ত করে রাখবে।"

সেই রহিমশাহ আপনা আপনি—কোন খবর ছিল না, কোথাও থেকে হঠাৎ সকালে এসে হাজির হবেন কেন?

তখন সবে পাশের গাঁও থেকে বুড়া কবিরাজজী এসে বসে তার নাড়িটি ধরেছেন—পানি গরম করা হচ্ছে—আগুনের আঙঠায় গনগনে কাঠের আগুন করা হয়েছে। অজ্ঞান লেড়কীর গর্দা ধুয়ে দিয়ে ওই আঙঠার আগুন থেকে কি কি পাতা বাঁধা পুঁটলির সেঁক দেওয়া হবে। এই নিদারুণ অত্যাচার—দুর্দান্ত পশুর মত দাঁত দিয়ে নখ দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে—তার উপর এই দুরন্ত শীতের রাতের হিমবর্ষণ হয়েছে ছিন্নবাসা কন্যাটির দেহের উপর। অসাড় নিস্পন্দের মত পড়ে ছিল। সবে সুরযদেওজী আসমানে উঠেছেন—তাঁর রোশনির সঙ্গে তাপ এসেছে—ঠিক এই সময়েই এসে পৌঁছুলেন ফকীরসাহেব।

যাচ্ছিলেন অন্যদিকে; হঠাৎ কাল সকালে কেমন মেজাজ হয়েছে বাম্নওলী হয়ে যাবেন তাই এসে পড়েছেন। ইচ্ছা ছিল কাল সন্ধ্যার আগে এসে পৌঁছুবেন কিন্তু তা পৌঁছুতে পারেননি। ফকীরসাহেব

'নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ রাত্রী দুপ্রহরের সময় ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে আর ঘুমুতে পারেননি—সারারাত ছটফট করেছেন। ঘড়ি ঘড়ি চেলাকে জিজ্ঞাসা করেছেন—দেখ তো পূরব তরফে আঁধিয়ার হালকা হয়ে এল কি না? দেখ তো শুকতারা কোথায়?

ভোর হতে হতে উঠে পড়ে চলে আসছেন।

বাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। ব্রাহ্মণদের আর লালাদের বুড়া বুড়ীরা গন্ধর্বী জাতটাকেই দুষছে।

ফকীরসাহেব বাড়ি ঢুকে কাউকে কোন কথা না বলে বেহোঁশ ওই গুলবদ্‌নীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কবিরাজজী বলে উঠেছিলেন—বাস—আবার কি—আর কুছ ডর নেহি। ফকীরসাব জীওনদাতা এসে গিয়েছেন। জরুর বেঁচে যাবে শঙ্কর।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—বাবুজী, এই হিসেবেই হল এক এক এক আর এক জুড়ে চার। তিন একে চার দুই আর দুই চার এ সবই আছে ওই হিসেবের মধ্যে। ওর চেয়ে সরল সহজ কিছু নাই। ওকে আর সহজ করে ভাঙা যায় না। গুলবদ্‌নীর নসীব এক—দুনিয়াতে পুণ্যের জোর এক—আর গুরু রহিমশাহের ওই লেড়কীর উপর স্নেহ সেও এক আর গুরু রহিমশাহ শয়তানকে রুখনেওয়ালা চিরকাল সে এক—এই নিয়ে চার বাবুজী। একটু ঘুরিয়ে বল দেখবে এক এক আর দুই এই নিয়ে চার হয়ে যাবে। গুরু রহিমশাহ হবেন দুই—তাই বা কেন পুণ্যের জোরের এক সেও রহিমশাহের সঙ্গে মিশে গিয়ে তিন হয়ে যাবে। বলতে পারবে তিন একে চার। গুলবদ্‌নীকেও পুণ্যের এক দিতে পার—তাতে দুই দুইয়ে চার হবে।

যাক কি হয়েছিল শোন। দুনিয়ার বাইরে যা ঘটে তার একটা চেহারা আছে কিন্তু ভিতরে আর একটা চেহারা আছে। সেই দুনিয়ার প্রথম দিন থেকে শয়তানের সঙ্গে আল্লাহতায়লার সিপাহীদের লড়াই।

আমাদের গুরু রহিমশাহজী ছিলেন আল্লাহতায়লার সিপাহী।

শয়তান সে সময় সারা হিন্দুস্তানে ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছে; তামাম হিন্দুস্তানে লড়াই কামড়াকামড়ি খুনখারাবী বেইমানি চুরি ডাকাতির সঙ্গে হিংসাবিদ্বেষের ঝড়ো হাওয়া বইছে—শরাব আফিংয়ের নেশায় মানুষেরা বুঁদ হয়ে থাকে; ঔরৎ দেখলেই বেটাছেলে—সে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত কুত্তি দেখে কুত্তার মত পাগলা হয়ে যায়।

বামন্ওলীর এক লেড়কী গন্ধর্বীর বেটী। নাচগান করা দেহ বেচা তাদের বৃত্তি। এ তারা করে আসছে। হঠাৎ তাকে দরকার কার হল তা বলতে পারি না। শয়তানের না আল্লাহতায়লার সিপাহী যারা শয়তানের সঙ্গে লড়াই করে তাদের না আমাদের গুরু রহিমশাহের তা বিচার করে বলা শক্ত।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—তুমি শোন। বিচার করে বলো শুনব।

শঙ্কর পাঁচ পাঁচ দিন বেহোঁশ হয়ে ছিল। সারা গায়ে চড়া তাপ আর তার সঙ্গে প্রলাপ। বুখারের মধ্যে গুলবদ্নী চিৎকার করছিল —নেহি নেহি নেহি। ছোড়ো মুঝে জী ছোড় দে মুঝে। তারপরই আর্তস্বরে চিৎকার করত—হজরত হজরত বাঁচাইয়ে—মুঝে বাঁচাইয়ে।

রহিমশাহ কপালের উপর হাত রেখে মনে মনে কোরান আবৃত্তি করতেন। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসত গুলবদ্নী।

ছদিনের দিন গুলবদ্নীর দেহের তাপ সহজ হয়ে এল—হোঁশ

ফিরল। সকালবেলা তখন, গুরু রহিমশাহ্ তানপুরা নিয়ে ভজনগান করছেন।

বলেছি তো বাবুজী আমাদের গুরু ছিলেন আজমীঢ়ের হজরত আবদুল কাদের জিলানীর সঙ্গে এক মতের মানুষ যাতে দুনিয়াতে হিন্দু কেরেস্তান ইহুদী মুসলমান কারুর সঙ্গে কোন ঝগড়া ছিল না। বলতেন—বেহেস্তের ফটক সব পুণ্যবান মানুষের জন্যে খোলা আছে, খোলা থাকবে! যে নামেই খুদাকে ডাকুক সে ডাক ঠিক মালিকের পায়ের তলায় পৌঁছে যায়। এক শয়তান এই ফটকে ঢুকতে পায় না। তার সঙ্গে শয়তানকে ভজে যারা তারা। বলেছি তো গোঁড়া মোল্লা-মৌলভীরা ফকীরসাহেবকে গালিগালাজ করত। তা করলেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না। পাঁচওয়াক্ত নামাজ তিনি পড়তেন, আবার সকালে সন্ধ্যায় ভজনগান করতেন—'মীরাকে পর্‌ভু গির্‌ধারীলাল বনশীবালা'—। আর রাধা প্যারী তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

বাবুজী, আমারও প্রিয়। আমিও থোড়াকুছ গানাবাজনা জানি। অবসর মিললে তোমাকে শোনাব। থাক—। এখন গুলবদ্‌নীর কথা বলি শোন। সেদিন সকালে গুরু যখন ভজন গাইছিলেন তখনই কখন যে গুলবদ্‌নীর হোঁশ ফিরেছে, চোখ মেলেছে, সে কেউ দেখেনি। ভজনের মধ্যে সব মানুষগুলির মন বাংলা মুল্লুকের রসের মিঠাইয়ের মত রসের কড়াইয়ে ভাসতে ভাসতে একেবারে পুরা ভিজে তলায় ডুবে গিয়েছে। চোখ গুরুজীরই পড়ল; এবং যখন পড়ল তখন গুলবদ্‌নীর মুখে ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি আর চোখের জলে সারা মুখখানা ভিজে চকচক করেছে।

গুরু রহিমশাহের চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই গুলবদ্‌নী আবার কেঁদে উঠেছিল; দুই চোখের ধারায় যেন গঙ্গাজী আর যমুনাজীর তুফান নেমে এসেছিল। গুরুজী নিজের হাতখানি তার কপালের উপর রেখে বলেছিলেন—মৎ রোমা। ন ন ন। রোতি কিঁউ বেটী!

গুরুর নিজের চোখেও আঁসু এসেছিল বাবুজী।

গুলবদ্‌নী বলেছিল—শয়তান গুরুজী উ—উ—।

*　　　*　　　*

গুলবদ্‌নী বলেছিল সে রাত্রের কথা। সেদিন বলতে পারেনি, পরে বলেছিল।

পুরোহিত মহারাজের বাড়ি থেকে রুটি মিষ্টান্ন আর কিছু রাবড়ি নিয়ে সে একরকম লুকিয়ে লুকিয়ে এসে উঠেছিল অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের উঠানে। এসে দেখতে পায়নি তাকে।

চাঁদনী রাত—মাটির বুক ঘেঁষে কুয়াসা জমেছে—পেঁজা তুলো যেন ছড়িয়ে পড়ে আছে; বাতাস ভারী ছিল ঠাণ্ডাতে; গালের উপর নাকের ডগায় যেন কনকনে একটা কিছু বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। একটা গন্ধও পাচ্ছিল সে কিছুর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে তাকে দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে খুঁজতেই সে মৃদুস্বরে ডেকেছিল—জনাবআলি! সা—হে—ব।

হঠাৎ পেয়ারা বাগিচার ও-মাথা থেকে সাড়া এসেছিল—আসছি। একটা ঘনপল্লব পেয়ারাগাছের তলা থেকে নবাবজাদা গোলাম কাদের সাহেব বেরিয়ে এসে চাঁদনির মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

—থোড়া কুছ ঘাবড়ে গিছলাম আমি হজরত। সে একা ছিল না—তার সঙ্গে আরও একজন লোক ছিল। সে লোকটা দেখতে কেমন, নোকর কি আমীর কি দেহাতী কি কোন্ জাতের লোক—হিন্দু না মুসলমান এর কিছুই তখনও দেখতে পাইনি বুঝতে পারিনি, তবু যেন বুকের ভিতরটায় কেমন ধড়ফড় করে উঠল। ভয় লাগল।

ডর মালুম হল হজরত। সে সাধারণ 'ডরানার' মত 'ডরানা' নয়। তার জাত যেন আলাদা। কেমন একটা 'বয়' গন্ধ আসছিল

বাতাসে। তার সঙ্গে আর কিছু ছিল যা শরীরে লেগে সারা শরীরটাকে যেন ভয়ে ভয়ে অবসন্ন করছিল।

তবু আমি বললাম হজরত—কিছু খানা এনেছি জনাবআলি—

সাহেবজাদা এগিয়ে এলেন, এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি আমাকে বাঁচালে। যে ভুখ আমার লেগেছে তাতে দুনিয়া আমার কাছে তিতা হয়ে গেছে। গাছে পেয়ারা খুঁজলাম, আমার নসীব মন্দ—একটা পেয়ারাও নেই। দাও। কি এনেছ দাও।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে হাত বাড়ালেন সাহেবজাদা। রুটি আর শক্কর ছিল একটা পাতাতে আর একটা মাটির ভাঁড়ে ছিল থোড়া রাবড়ি—নামিয়ে দিলাম। সাহেবজাদার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। আমাকে বললেন—বস তুমি মেরী প্যারী বস।

আমি ভয় পেলাম চমকে উঠলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পুরোহিত মহারাজকে জবান দিয়েছেন নবাবজাদা—তার সঙ্গে কসম পর্যন্ত খেয়েছেন—বলেছেন—খুদা কসম।

আমি বললাম—জনাবআলি, আপনি একটা মুলুকের মালিক, লাখো লাখো মানুষের রক্ষাকর্তা দণ্ডদাতা অন্নদাতা—আপনি হাত উঠালে মানুষের ধড় থেকে গর্দান খসে পড়ে যায়। আপনি সামান্য অনুগ্রহ করলে গরীবগুলার ভাগ্য ফিরে যায়। আমি আপনার থোড়া সেবা করতে পেরে ধন্য হয়ে গিয়েছি—আমি আপনার বাঁদী দাসী।

সাহেবজাদা ওয়া ওয়া করে উঠলেন। শিউজীতলার শান্ত স্থির জ্যোৎস্না চমকে গেল সে আওয়াজে—গাছের মধ্যে থেকে বাদুড় উড়ে গেল পাখা ঝটপট করে—কাছে আশেপাশে কয়েকটা বড় ঝিঁঝিঁপোকা একটানা কটকটে ডাক ডেকেই চলেছিল তারা চুপ করলে। আমি চমকে উঠে বললাম—চুপে চুপে কথা বলুন জনাব-আলি! গাঁয়ের কেউ যদি শুনতে পায়!

তিনি বললেন—ঠিক বাত প্যারী। কিন্তু আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই চাঁদনীতে বস্‌রাই গুলাবের আধফোটা ফুলের মত তুমি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে; আর চারপাশে এই সুন্দর হালকা কুয়াসা; এই নির্জনতা আমাকে মাতাল করে দিচ্ছে। আর এই আরক্। মনে হচ্ছে গজল তৈরি করি।

একটা ছোট শিশি বের করলেন তিনি। ছিপি খুলে খানিকটা খেয়ে মুখ মুছলেন। তার ঝাঁঝ এসে আমার নাকে ঢুকল, বহুত তেজী আরক, আমার সারা শরীর যেন কেমন করে উঠল।

সাহেব বললেন—তাছাড়া এখন আমি একা নই প্যারী। আমার এক দোসর এক জবরদস্ত সিপাহী এসে গেছে। আমাকে ছেলের মত পেয়ার করেন বাদশাহের হারেমের নাজির মনজুর আলি সাহেব—তিনি এক সর্দার পাঠিয়ে দিয়েছেন এক ঘোড়াও পাঠিয়েছেন, সে থাকতে ভয় আমি করি না প্যারী! কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন—তুমি বস।

শঙ্কর বলেছিল সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ভয় পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিল যে তার গন্ধর্বী কুমারী মনে এক নয়া রাগের আমেজ তৈরী করে দিয়েছিল।

কিছুটা বুঝি সবটা বুঝি না—খানিকটা ধরা যায় বাকীটা যায় না—কেমন অস্বস্তি লাগে—সব যেন গোলমাল হয়ে যায় এমনিতরো একটা অবস্থা।

সেই অবস্থার মধ্যে কিশোরী গুলবদ্‌নী নবাবজাদাকে বলেছিল—আমি যাই জনাবআলি। বাড়িতে দেখতে না পেলে আমার খোঁজে লোক বেরিয়ে পড়বে।

তখন আরকের নেশায় নবাবজাদার মেজাজ খুব শরীফ হয়ে উঠেছে। নবাবজাদা বলে উঠেছিলেন—না। কুঁয়র (কুমারী) তুমি মৎ যাও। তুমি যেয়ো না। তুমি গেলে আসমানে ওই যে চাঁদ রয়েছে

ও চাঁদ কালো মেঘ এসে ঢেকে দেবে—আঁধিয়ারায় বিলকুল সব কালো হয়ে যাবে। তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ কিন্তু সে জান আমার ছিনিয়েও নিয়েছ। প্যারী, তোমার মত অপরূপ সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। তুমি যেয়ো না। লোক যদি আসে তো আসুক—তারা আমাকে মেরেই ফেলুক। কি হবে আমার বেঁচে যদি তোমাকে না পাই?

পাকা গন্ধর্বিনী বাঈ হলে সে হয়তো মনে মনে হাসত। হয়তো সেও আরও বানিয়ে বানিয়ে ভাল কথা বলত। কিন্তু এ মেয়ে কিশোরী মেয়ে। এখনও পর্যন্ত যে ব্রতধারিণীর মত গুরুর কাছে গানবাজনা শেখে—গন্ধর্বীদের যে পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ আছে নীতিকথা ধারাপাত আছে তাই শেখে; শেখে জীবনের প্রথমেই একজনের সঙ্গে তার মালাবদল হবে বক্ষসর হবে। কিন্তু সেই হবে তার প্রিয়তম জন। তার নাম বলতে নাই; তার সঙ্গে লোকজানাজানি করে দেখা করতে নেই; তার কাছে কোন কিছু দাবি করতে নেই, এক গোপন প্রেম ভালবাসা ছাড়া। তার বুকের উপর পড়ে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যেতে হয়।

কিশোরী গন্ধর্বিনী কুমারী শীতশেষের উতলা বাতাসে অশত্থগাছের পাতার মত ভিতরে বাহিরে থরথর করে কাঁপছিল।

ঠিক এই সময়েই সেই লোকটি একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে এনে সামনে দাঁড়িয়েছিল। কালো হাবসী একজন। মসলিনের মত মিঠি জ্যোৎস্নায় তার প্রকাণ্ড মিশকালো মুখখানার মধ্যে সাদা দুটো চোখ আর সাদা ধারালো দুপাটি দাঁত শুধু ঝকঝক করছিল। লোকটা হাসছিল। গুলবদনী তাকে দেখে আতঙ্কে চমকে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে জড়িয়ে ধরেছিল গোলাম কাদেরকে। ভীরু পাখীর মত সে কিশোর নবাবজাদার বুকের তলায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। আরও ভয় পেয়েছিল সে একটা কুকুরের ভয়ংকর

আওয়াজে। দূরে কুকুরটা দাঁড়িয়ে শিউজীর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত একটা চাপা গর্জন করে চলেছিল। চাপা গলায় লোকটা ফিসফিস করে নবাবজাদাকে বলেছিল—হুঁ, এই ছোকরী ? আঁ ?

—হ্যাঁ।

—আ—চ্ছা !

—আচ্ছা নয় ? তোমাকে বলিনি ?

গুলবদ্‌নী লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কালো হাঁড়ির মত বড় মুখের মধ্যে অল্প দাড়ি গোঁফ এখানে ওখানে—দুচারগাছা ছাড়া দাড়ি গোঁফ নেই বললেই হয়। মাথায় কোঁকড়া মোটা চুল থুপা বেঁধে রয়েছে। লোকটাকে দেখে মনে হয় ওর মধ্যে দিল নাই কলিজা নাই—চোখে ওর জল নাই—লোকটা যেন পাথরে গড়া। দেখলে যেন শরীর হিম হয়ে যায়। সে বললে—বহুৎ আচ্ছা সাহেবজাদা ! তোমার নজর ভাল—তোমার নসীব ভাল। এ ছোকরী আরও ভাল। এতো নূরবাঈয়ের মত সারা দিল্লী পাঞ্জাবকে মাতাল করে দেবে পাগল করে দেবে।

চমকে উঠেছিল শঙ্কর। নূরবাঈ ? নূরবাঈয়ের কথা সে শুনেছে বইকি ! বাদশাহ মহম্মদশাহের আমলে নূরবাঈ ছিল দিল্লীর শ্রেষ্ঠ বাঈ। দেওয়ানী আমের সামনে আসর পেতে নূরবাঈয়ের মুজরা হত। সারা দিল্লীর লোকের চোখে খোয়াব নামত।

ইরানের বাদশাহ শাহ নাদের পর্যন্ত নূরবাঈয়ের রূপে গুণে গানে নাচে এমন মোহিত হয়েছিলেন যে ময়ূরতক্ত কোহিনূরের সঙ্গে তাকে ইরান নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে খবরে সারা দিল্লী কাঁদতে বসেছিল। কিন্তু নূরবাঈ হতে সে পারবে না। না। সে নবাবজাদার আরও কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—নেহি নেহি নেহি ! তুমি খুদা কসম বলেছ—খুদার নামে কসম খেয়েছ নবাবজাদা—

——আঃ—! একটা বিরক্তিসূচক চিৎকার যেন একটা বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়েছিল সেই মুহূর্তে; হাবসী সিপাহী বা সর্দারটি সজোরে ডান পা ঠুকে চিৎকার করে উঠেছিল। লোকটি সিপাহী নয়—পোশাকে যেন সম্ভ্রান্ত।

কি কারণে তা বুঝতে পারেনি গুলবদ্‌নী। কিন্তু চমকে উঠে জড়িয়ে ধরেছিল নবাবজাদাকে। নবাবজাদা তার উচ্ছিষ্টহাতেই মুখের আহার ফেলে দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে চেপে ধরেছিল। এবং অভয় দিয়ে বলেছিল—পিয়ারী মেরী পিয়ারী—। আমার আঁখোকি রোশনি—আমার দিলবাগিচার বুলবুল। ডর কিসের? 'কালাশের' খানিকটা পাগল মেজাজের মানুষ! তবে ও যার সিপাহী দুনিয়াতে তার কোন দুখ হয় না—কোন ডর হয় না। ওরই দৌলতে আজ আমি বাদশাহী কয়েদখানা থেকে পালাতে পেরেছি—ওরই দৌলতে আজ পিছনের সিপাহীদের হাত থেকে ফসকে যেতে পেরেছি। ওই আমাকে বের করে ঘোড়ার উপর সওয়ার করে দিয়ে বলে দিয়েছিল—পালাও। যদি বাদশাহী ফৌজ পিছে ধাওয়া করে তবে কোন ফসলভরা ক্ষেতের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে লুকিয়ে পড়ো; তার আগে ঘোড়ার পিঠের উপর ছুরি দিয়ে খানিকটা চিরে দিয়ো। তাহলে ঘোড়া বেসওয়ারী হয়েও ছুটবে। তুমি লুকিয়ে থেকো ক্ষেতির ফসলের মধ্যে। তুমি ভয় করো না—আমি বাদশাহী সিপাহীর সঙ্গে থাকব। যেখান থেকে তুমি নিখোঁজ হবে সেখানেই আমি ঠিক গিয়ে হাজির হব। কালাশের ঠিক জবান রেখেছে তার। সে ঠিক এসেছে। ওকে তুমি ভয় করো না। ও আমার ধরমবাপ মনজুর আলির দোস্ত। তার ডান হাত।

চুপ করে গুলবদ্‌নী সব শুনেই যাচ্ছিল। সে একটা বিচিত্র অবস্থা তখন তার। সামনে দাঁড়িয়ে কালাশের হাবসী, তাকে দেখে

একটা ভয় তাকে একদিকে আচ্ছন্ন করছিল অন্যদিকে চৌদ্দ পনের বছরের কিশোরী গন্ধর্বী কুমারী ওই তরুণ কিশোরের আলিঙ্গনের মধ্যে যেন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করছিল যে উত্তাপে সে বিগলিত হয়ে যাচ্ছিল।

নবাবজাদা অকস্মাৎ তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিলেন—হাঁ পিয়ারী জবান আমি দিয়েছি কসম আমি খেয়েছি ; তার ইমান আমি ভাঙব না। চল তোমাকে নিয়ে আমি এখান থেকে এখুনি রওনা হয়ে যাই। ওই ঘোড়ার উপরেই তোমাকে তুলে নেব—আমার পিঠের সঙ্গে বেঁধে নেব। চলে যাব ঘাউসগড় পাখলগড়—কালই মসজেদে গিয়ে খুদার নাম নিয়ে তোমাকে সাদী করব। কালাশের—নূরবাঈ নেহি নূরমহল হবে আমার পিয়ারীর নাম। আমি জরুর একদিন বাদশাহ হব। আমার পিয়ারী হবে বেগম নূরমহল –

—নে—হি! একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে এগিয়ে এসেছিল কালাশের। আতঙ্কে এবার সচেতন হয়ে উঠেছিল গুলবদনী। নবাবজাদাও যেন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবং ভয়ার্তভাবেই বলেছিল—কালাশের!

কালাশের বলেছিল—আমি তোমার বান্দা নই তোমার আমি গোলাম নই। তুমিই নিজে বল কি বলেছিলে? বল?

—তুমি আমাকে বাঁচাও—আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

—আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি কি না? বাতাও?

—হ্যাঁ বাঁচিয়েছ।

—তুমি তাহলে আমার কেনা কি না?

—হ্যাঁ। তাই হয়। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই নবাবজাদা। যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে যাব রাখব ততক্ষণ তুমি আমার কেনা। শুনো। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব

—তোমাকে আরামে রাখব—তোমাকে বাদশাহের বাদশাহ করব ; তোমাকে শ্রেষ্ঠ ঔরৎ দেব ; সব সব দেব যা চাইবে। শুধু এক ঝড়ার হ্যায়। এক কড়ার! খুদাকে মানবে না, ইমানকে মানবে না, জবানের কোন দাম নেই—তা রাখবে না। এ লেড়কীকে সাদী তুমি করবে না। এ হবে তোমার হাতিয়ার। এই ছোকরীকে সামনে রেখে শিকার করবে শাহ আলম বাদশাহের শাহজাদাদের।

এবার চিৎকার করে উঠেছিল গুলবদ্‌নী!—নে—হি!

সে চিৎকার তার পুরা শেষ হয়ে গলা থেকে বেরিয়ে যেতেও পারেনি—সে ভয়ে চোখ বুজে থরথর করে কেঁপে মাটিতে বসে পড়েছিল।

গুলবদ্‌নী ফকীর গুরুকে বলেছিল—হজরত, আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—দেখছিলাম তার কালো বড় মুখটার মধ্যে সেই হিংস্রতায় ঝকঝকে চোখ দুটো, বড় বড় সাদা দাঁত দুপাটি ; ভয়ে একসময় চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলাম। চাইলাম সামনের দিকে—দেখলাম সাদা কুয়াশায় ভরে গেছে—যেন ধর্‌তির বুকের ভেতর আগুন লেগেছে, তার ধোঁয়া উঠে সব ভরে দিয়েছে—সে দেখেও ভয় লাগল—আমি মাটির দিকে তাকালাম। হজরত!

দুই হাতে মুখ ঢেকে শঙ্কর হজরত রহিমশার সামনে বসেও কেঁপে উঠেছিল।

হজরত তাকে বলেছিলেন—ভয় কি বেটী? কি ভয়? আমি রয়েছি।

গুলবদ্‌নী বলেছিল—হজরত, দেখলাম সেই 'কালাশের' হাবসী সিপাহীর পায়ের পাতা দুটো মানুষের পায়ের মত নয়।

জানোয়ারের পায়ের মত। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

গুল্‌বদ্‌নীর জ্ঞান ফিরেছিল একটা বিচিত্র নিষ্পেষণের যন্ত্রণার মধ্যে। তখন উপরে পাশে সব অন্ধকার। চাঁদনীর আলো নেই; অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের চূড়া নেই মন্দির নেই, কুয়ো নেই। সব অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা অসহায়া মৃতপ্রায় হরিণীকে যেমন বাঘে ছিঁড়ে খায় তেমনি নৃশংসভাবেই তাকে কেউ ছিঁড়ে খাচ্ছিল। জানোয়ারের মত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তাকে, তার নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল তার কাঁচুলি তার সমস্ত আবরণ।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে এক মর্মান্তিক স্মৃতি।

সে কয়েকবার মিনতিভরে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল—খুদা কসম—নবাবজাদা জনাবআলি কসম খুদাকি—শাহজাদা—

যতবার বলেছে ততবার বাঘ যেমন থাবা মারে তেমনি ভাবে থাবা মেরেছে তার মুখের উপর। আর চাপা গলায় গর্জে গর্জে উঠেছে—চুপ্ চুপ্ চুপ্ রহো! আঃ—চুপ!

কালাশেরের কোন সাড়া পায়নি। একবার হঠাৎ সেই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে তাকে সে দেখতে পেয়েছিল; কালাশের একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল; দেখছিল নয়, দুটো জ্বলন্ত চোখ দিয়ে যেন গিলছিল।

পাশে ছিল তার সে কুকুরটা। মাঝে মাঝে সেটা গর্জাচ্ছিল—অঁ অঁ শব্দ করছিল।

কথা বলেছিল কালাশের, শেষকালে; পূর্ণোদর বাঘের মতই যখন নবাবজাদা গোলাম কাদের তাকে ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে চাচ্ছিল—তখন। সেই মুহূর্তে কালাশের বলেছিল—খতম্ কর দো

সাব। শেষ করে দাও ওকে শেষ করে দাও। কি হবে ওকে রেখে। আমি বলছি তোমাকে, এ লৌণ্ডি খুদার নাম ভুলবে না। রহিমশার মুরিদা। ও ডাকছিল তাকে—শুনতে পাওনি তুমি? তাকে ও ডাকছিল। না হলে ও তোমাকেও শেষ পর্যন্ত ভজাতে চাইবে জপাতে চাইবে। আর বাঁচলে ও তোমাকে ভুলবে না। দাও ওকে শেষ করে দাও।

পরক্ষণেই গুলবদ্‌নী একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করেছিল পাঁজরার নীচে।

(সাত)

সেকেন্দ্রার সামনের খোলা জায়গায় যে বাগিচা, সেই বাগিচার একটি গাছের ছায়ায় বসে বৃদ্ধ ফকীর আমাকে গল্প বলছিলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। পাশে বসে ছিল আফজল। ফকীর সাহেবের আরও দু তিনজন মুরিদও বসে ছিল।

ইতিহাসের কথা আমি জানি। বাদশাহ শাহ আলমের জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী ইতিহাসে পড়েছি। সেই সময়ে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা আমার মনের মধ্যে আলাদা দুটো চোখের সামনে ভাসছিল।

হিন্দুস্তান ফেটে চৌচির হতে চাচ্ছে; জল শুকিয়ে যাওয়া মজা পুকুরের তলার মত ফাটলের দাগে দাগে যেন সীমানাবন্দীর জরীপের শিকলের দাগ আঁকা হয়ে গেছে। গোটা দক্ষিণ আলাদা; পানিপথের পর বর্গীদের শক্তি ভাগ হয়ে পাঁচ টুকরো হয়েছে। পেশোয়া নামে মারাঠাদের নেতা। সিন্ধিয়া হোলকার গাইকোয়াড় নাগপুরে ভোঁসলা এরা সব আলাদা। ওদিকে হায়দ্রাবাদে নিজাম।

রাজস্থানে রাজপুত রাজারা। পাঞ্জাব ছিনিয়ে নিয়েছিল আমেদশা আবদালী। আবদালীর পালা শেষ হল। শিখেরা উঠেছে সেখানে। আফগান নবাবেরা খামচে খামচে মাটি তুলে দখল করে বসেছে। রোহিলখণ্ড পুরা ছিল বাদশাহের খাস এলাকা—সে এলাকা দখল করেছিল রোহিলা আফগানেরা—এই গোলাম কাদেরের পিতামহ ইতিহাসবিখ্যাত নবাব নাজিবউদ্দৌলা, হাফিজ রহমৎ; এ ছাড়া জালালাবাদে 'ওরাক্‌জাই' পাঠান এলাকা গড়ে উঠেছে; লোহারীতে আফ্রিদি পাঠানেরা ঝাণ্ডা গেড়েছে; ঘাউসগড়ে নবাব নাজিবউদ্দৌলার আপন স্বজন 'উমরখেল' পাঠান বসেছে। ওদিকে ফারাক্কারবাদে নবাব বাঙ্গাশ; সুবা অযোধ্যা দখল করে বসে আছে নবাব সফদরজঙ্গের উত্তরাধিকারী নবাব সুজাউদ্দৌলা; নবাব সুজাউদ্দৌলাই দিল্লীর বাদশাহের উজীর। নবাব শাহজাদা আলি-গহরকে সঙ্গে নিয়ে বক্সারে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে হেরেছে। তারপরও নবাব শাহজাদাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। এখনও সুজাউদ্দৌলা বাদশাহ শাহ আলমের অসম্মান করে না বটে কিন্তু কোন খাজানা অযোধ্যা থেকে আসে না। উজীর সুজাউদ্দৌলা লক্ষ্মৌএ বসে শরাব আর ঔরৎ নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। ওদিকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম চলে গেছে ইংরেজী ফিরিঙ্গীর হাতে। শাহ আলম আটাশ লক্ষ টাকায় ইংরেজকে দেওয়ানী দিয়েছেন।

দিল্লীতে লালকেল্লায় বাদশাহী তক্ত এগার বছর শূন্য হয়ে পড়েছিল। বাদশাহ শাহ আলম দিল্লী ঢুকতে পাননি। তাঁর মা জিনতমহল আর তাঁর বড়ছেলে শাহজাদা জোয়ানভক্তকে নজর-বন্দীর মত আগলে রেখে বসেছিল এই নবাব নাজিবউদ্দৌলা।

জাঠেরা তখন একরকম খতম হয়ে এসেছে।

দিল্লীতে বাদশাহী নেই। জলুস নেই। আছে শুধু বাঈপাড়ায় নাচ গান হল্লা; রাত্রে গলিঘুজিতে খুন; কখনও কখনও কোন

মনসবদার কি সর্দারের ইনকিলাবি। বাকী তলবের জন্তে বাজার হাট লুঠ। কোন মহল্লায় আগুন লাগানো। আর সারা দিনে দশ বিশটা খবর আসে, মাহাদজী সিন্ধিয়া তার বর্গী ফৌজ নিয়ে আগ্রা এসে পৌঁচেছে। কখনও খবর আসে গুজর ডাকাতেরা মীরাট থেকে আলিগড়, আলিগড় থেকে নাজিবাবাদ পর্যন্ত এলাকায় লুঠ চালিয়ে বেড়াচ্ছে। চণ্ড গুজর লুঠ করেই নিরস্ত থাকে না আগুন জ্বালিয়ে সব ছাই করে দেয়। ওদিকে পাঞ্জাবে শিখেরা এক এক সর্দারের অধীনে জমায়েত হয়ে লুঠ চালাচ্ছে। টাকা লুঠ হয়, ঘর পুড়ে যায়, মা বোন বেটী কেড়ে নিয়ে যায়। শুধু তাই বা কেন? তখন ধর্মের নামে জাঠরাজা রতন সিং ব্রজমণ্ডলে চার হাজার কসবী ভাড়া করে এনে রাসযাত্রা করেছিল। নবাব সুজাউদ্দৌলা হাফিজ রহমতের বেটীকে লুঠে এনেছিল।

ফকীরসাহেব বললেন—না বাবুজী আমি আরও কিছু আগের আমলের কথা বলছি। বলছি কালাশেরের জন্মকালের কথা। নাদিরশাহ তখনও আসেনি। তখন দিল্লীর বাজার চৌক হাট ঘাট একেবারে রোশনাইয়ে ঝলমল; শরাবের ঢেউ বইছে। ব্যভিচারের আর শেষ নেই। সে আমল একটা বিশ্রী কাল, বড় খারাপ আমল। শহরে বাজারে বাবুজী ভোরবেলা দেখা যেত একটা কি দুটো সদ্যোজাত মরা ছেলে ন্যাকড়া ঢাকা পড়ে আছে। গৃহস্থীদের মধ্যে এমন পুরুষ অনেক ছিল যারা বিয়ে করা বউ বেচে দিত; পথে ছেড়ে দিয়ে আসত; বড় বড় ঘরের আমীরেরা রাজারা হারেমে অন্দরমহলে দু পাঁচ শো ঔরৎ রাখত। কেউ বেগম কেউ বাঁদী। এক একজনের আবার বিচিত্র শখ ছিল—তারা নানান জাতের বাঁদী কিনত। ঘরে রাখত। বাবুজী এক হিন্দু সর্দারের এমনি শখ ছিল। সেই শখে সে কিনেছিল কাফ্রী বাঁদী। আর সে বাঁদী ছিল

তার বড় পিয়ারী। এর পেটে হয়েছিল এক কালো ছেলে। দুর্দান্ত আর বদমাশ। আমীরের ছেলেতে মেয়েতে কম করে ছিল তিরিশ বত্রিশ জন। এক বিয়ে করা স্ত্রীর পেটের এক কন্যা ছিল। অপরূপ সুন্দরী। আর দুর্ভাগ্য যে বিয়ের পরই হল বিধবা। বিধবা বেটী এল বাপের ঘর। এরপর সেই বিধবা বেটী আর এই কালো বেটা একদিন ঘর ছেড়ে পালাল।

বাবুজী, বিয়ে করা স্ত্রীর পেটের মেয়ে আর রক্ষিতার ছেলে—সম্পর্কে ভাই বোন; তারা পালাল বাবুজী। পালাল কামার্ত হয়ে। তাই বলছিলাম বাবুজী সে আমলটা ছিল বড় বিশ্রী কাল; বড় খারাপ আমল। মানুষ যখন জানোয়ার বনতে যায় তখনই এমন হয়। যাক বাবু—এখন যা হল তাই বলি। এরা পালাল দেহের তাড়ায়। কিন্তু আমীরের মাথায় খুন চড়ল। বললে মাথা আন। এরা ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। আজ এখান কাল ওখান। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। ওই মেয়েটা রূপসী ছিল। আর এই কাফ্রী বাঁদীর ছেলেটার ছিল না কোন মায়ামমতা। এই মেয়েটাকে সে বেচে দিল এক গোলামের কারবারীকে। মেয়েটার পেটে তখন এই 'কালাশের' এসে গেছে। মেয়েটা এসে পৌঁছে গেল দিল্লী শহরে এক কসবীবালীর ঘরে। পেটে বাচ্চা নিয়ে বাঁদী কিনলে পেটের বাচ্চাটাকে বিনা পয়সায় গোলাম মেলে। কিন্তু ঔরৎ কিনে যারা কসবী করায় তারা তা কেনে না। কিন্তু মেয়েটার সুরত দেখে সেই ঘাঘী কসবীবালী কিনতে পিছোয়নি। সে তাকে কিনেছিল। লেড়কা হলে গোলাম করে বিক্রি করবে। লেড়কী হলে তার নিজের কারবারে লাগাবে।

মাসকতক পরে এই বাচ্চা পয়দা হল বাবুজী, পাদুটোই নীচের দিকে দুমড়ানো মোচড়ানো। এ বাচ্চা কে নেবে? নিয়ে কি করবে? মেরে ফেলতে চেয়েছিল কসবীবালী। কিন্তু তার পা জড়িয়ে ধরে

ওই মাটায় বুকচাপড়ানি কান্নার জন্যে তা পারেনি। ভেবেছিল—ঠিক আছে। ওকে খোজা করে বিক্রি করবে। বাচ্চাটা শত অযত্নে মরল না বাবুজী—দু তিনবার বেমারী হল বাবুজী, একবার খুব খারাপ ধরনের হাম হয়েছিল—তাতে লেড়কারা বাঁচে না—সে হাম হয়েও বাঁচল কালাশের।

কালাশের তো মরবার জন্য পয়দা হয়নি বাবুজী। কালাশের পয়দা হয়েছিল খোদার দুনিয়াকে জবরদখল করে নেবার জন্যে। দুনিয়া থেকে খুদার নাম ইমানের দাম ধরমকে নিশান সব মুছে দেয় উপড়ে দেয়—জিন্দিগীর আওয়াজ পুরা বদলে দেয়। ওই যে কালাশের গোলাম কাদেরকে বলেছিল—তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি, বাঁচাব; তোমাকে দুনিয়ার সেরা ঔবৎ দেব—সোনা দেব দানা দেব—বাদশার বাদশা বানাব—কিন্তু তুমি খুদাকে মানতে পাবে না ইমানকে রাখবে না জবানের দাম দেবে না ধরমের নিশানকে নামিয়ে ছিঁড়ে দেবে; ওরই জন্যে ওর পয়দা হয়েছিল। ও মরবে কেন? এক বাপের ছেলে আর মেয়ে, মা ভিন্ন—এরা দুনিয়ার সব জায়গায় ভাই বহেন। ভাই বহেন বাবা বেটী লেড়কা মা এসব জানবারে বাছে না বাবুজী। দুনিয়ার সেই প্রথম কাল থেকে আজ এ চলে আসছে সারা দুনিয়া জুড়ে; জানবার পয়দা হচ্ছে জানবার মরছে; তবুও সেই দিন-রাত হচ্ছে—খুদা সেই মালিক আছেন দুনিয়ার। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ কানুন বদল হয়ে গেল। মানুষই বদল করলে। জানবারের খুদা ছিল না। মানুষ খুদাকে পেলে, আল্লাহতায়লার ফিরিস্তা এসে পয়গম্বরকে ডাক দিয়ে বলে গেলেন। দিয়ে গেলেন মানুষের কানুন। পয়গম্বরই মানুষকে দিয়ে গেলেন ইমান আর জবান। জানবার যা করে মানুষ তা করে না—তার উলটো করে বলেই মানুষ মানুষ। জানবার পরের খানা কেড়ে খায়—মানুষ মুখের খানা আর একজনকে দেয়। তাই সে মানুষ।

তামাম মানুষেরা যে বিলকুল পয়গম্বরের হুকুমৎ মেনে চলে,, তা চলে না। তার খেলাপ তারা করে। তছরুপও করে। খুদাকেও ভোলে ইমানও রাখে না জবানও খেলাপ করে। বাবুজী, ছুনিয়াতে আদমী আর ঔরৎ মিলেও মানুষের কানুন খেলাপ করে—ভাই বহেন, বাপ বেটী পর্যন্ত পাপ করে গুনাহ করে বাবুজী। এ করে বাবুজী। লাখ লাখ এমন গুনাহ হয় ছুনিয়াতে—কিন্তু ওই যে মানুষ মনে মনে মানে খুদাকে, মানে ইমানকে ধরম্ নিশানকে খাড়া রাখে, রাখতে চায় তাতেই পাপ হেরে যায়—তাতেই দনিয়াতে খুদার রাজ কায়েম থেকে যায়। কিন্তু এমন কালও আসে জনাব—এমন আমলেরও পর্দা ওঠে বাবুসাহেব যে-যুগে যে-কালে 'কালাশের' এসে আওয়াজ তুলে সওয়াল করে—কি হয়? ভাই বহেন যদি মিলেই যায় তাতে কি হয়? কি হয় মানুষের জান নিলে? খুন করলে? কি হয় শরাব খেয়ে পাগল হয়ে গেলে? কি হয় খুদাকে না মানলে? কি হয় জবানের দাম না দিলে? তখন বুঝতে হয় বাবুজী ছুনিয়া ওলটাচ্ছে। ছুনিয়ার মানুষের ছুনিয়া মরছে—মানুষ জানোয়ার বনছে। তখন বাবুজী পানির চেয়ে শরাব ভাল লাগে বেশী। শরাব চলে বেশী। তখন বাবুজী রোটির চেয়ে আওরতের খোঁজে মানুষেরা ছুটে বেড়ায় বেশী। তখন আর কোন চিন্তা থাকে না—আর কোন সাধ থাকে না খেদ থাকে না ঔরতের সাধ ঔরতের খেদ ছাড়া। মেয়েদেরও তাই হয়। তারা ছেলে ফেলে দেয়—খোঁজে পুরুষ। তার বাপ ছাড়ে মা ছাড়ে সব ছাড়ে—খোঁজে পুরুষ। বাবুজী, সারা দেশে তুমি জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর—খেদ কিসের? ক্ষোভ কিসের? দেখবে, ঔরৎ বলবে পুরুষের—পুরুষ বলবে ঔরতের!

তা না হলে বাবুজী শাহ নাদের যখন ঢুকল হিন্দুস্তানে—আটক পার হল তখন হিন্দুস্তানের পাঠান মুঘল রাজপুত জাঠ

সিপাহী সিপাহসালার আমীর উজীর খান-ই-খানান থেকে খুদ বাদশা মহম্মদশা তক নূরবাঈয়ের নাচে গানে এমন মশগুল যে, সিপাহীদের তৈয়ার হবার জন্যে হুকুম দিতে ফুরসত পর্যন্ত মিলল না।

বাবুজী, তামাম হিন্দুস্তান তখন ব্যভিচারে অতৃপ্তির খেদ নিয়ে গানা গাইছে ইনিয়ে বিনিয়ে। পচ ধরে গেছে তখন দেশ জুড়ে; পচতে আরম্ভ করেছে পনের আনা মানুষ। সেই সুযোগ পেয়ে নাদিরশাহ এসে দিল্লী শহরে খুন খুসরোজ খেলে চলে গেল। লালকিল্লার পাশে ইরানী ইরাকী পাঠান সিপাহীরা আমীর রাজা থেকে গৃহস্থী গরিবের ঔরতদের বকরীর মত বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে তামাম রাতভর ওই গোলাম কাদের যেমন বাঘের মত গুলবদনীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল তেমনি ভাবে তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিল। আর তাদের চিৎকারে দিল্লীর আকাশ ভরে গিয়েছিল।

এসব তুমি জান বাবুজী আমি জানি। কিতাবে পড়েছ। আমাদের গুরুর গুরু রহিমশাহ এ আপনা আঁখসে দেখেছিলেন বাবুজী।

এই সময়েই বাবুজী দিল্লীর বাঈমহল্লার সামনের রাস্তা এক হাঁটুভর রক্তের কাদায় ভরে গিয়েছিল। দিল্লীর সেই কসবাবালীর বাড়ি থেকে সেই লেড়কা 'কালাশের' সেই খুনী রাতে নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। সেই ভীষণ রাত্রে দিল্লীর সেই আঁধারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছিল।

নাদিরশাহী খুন আর লুঠ আর ঔরৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সে দুই চোখ ভরে দেখেছিল। আর বিচিত্রভাবে ওই ইরানী সিপাহীদের কাছে বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠে সে সারা কসবীপাড়ার ঔরৎ আর দৌলতের খবর তাদের জানিয়েছিল।

তার মালকিন কসবীব্যবসাবালীকে যখন খুন করে তখন সে দাঁড়িয়ে ছিল—দেখে হেসেছিল। বাড়ির মেয়েগুলোকে তার সঙ্গে তার মাকেও যখন ইরানী সিপাহীরা ভেড়ীর মত দড়িতে বেঁধে নিয়ে যায় তখনও সে ছিল তাদের সঙ্গে।

ফিরেছিল সে পাঞ্জাবের মাঝপথ থেকে। তার বেমারী হয়েছিল বলে ইরানী সিপাহী তাকে পথের ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে মরেনি। কোনরকমে ভাল হয়ে উঠেছিল এবং কিছুদিন পর সে আবার দিল্লী ফিরে এসেছিল। তখন সে খোজা হলেও কারুর কেনা গোলাম নয়। সে মুক্ত।

দিল্লীর সেই কসবীবাজারের পাশে সে পেতেছিল তার জীবনের বাসা। পেশা করেছিল সেই কসবীপাড়ার খরিদ্দার ধরা। তার সঙ্গে কড়া নেশার দালালি।

তখন থেকেই কালাশের বলত—ঝুট বাত, ঝুট হ্যায়। খুদা ঝুট ইমান ঝুট জবানের দাম ঝুট বেহেস্ত ঝুট—সব ঝুট। পানির চেয়ে শরাব আর রুটির চেয়ে আওরত সস্তা করে দাও—বেহেস্ত তৈরী হয়ে যাবে এই মাটির দুনিয়ায়।

নাদিরশাহের পর আমেদশাহ আবদালী। একবার নয় বারবার। তারপর বর্গী জাঠ। এরই মধ্যে সে বড় হল বাড়ল; পানিপথে যখন বর্গীদের সঙ্গে আবদালীর লড়াই হল তখন সে পুরা জোয়ান। বয়স তখন তিরিশের কাছে। শাহ আবদালীর সিপাহীরা দিল্লী থেকে মথুরা গোকুল পর্যন্ত লুঠ করে আগুন ধরিয়ে মানুষকে কেটে মুর্দা আর মুণ্ডুর পাহাড় বানিয়ে মুলুক্‌টা শ্মশান করে দিয়ে যখন যায় তখন কালাশের তাদের সঙ্গে ছিল।

কারবার তখন তার জমাট হয়ে উঠেছিল। আপনাআপনি হয়ে ওঠেনি নিজের এলেমে সে জমিয়ে তুলেছিল।

লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল সে শাহ আবদালীকে

তসলীম দিতে, কুর্নিশ জানাতে। শাহ আবদালীর ধরমবেটী মুঘলানি বেগমের সঙ্গে তার আঁতাত আগে থেকেই ছিল। দিল্লীর বাদশাহী হারেমের আর বাদশাহ গোষ্ঠীর কার ঘরে কেমন খুবসুরত নওজওয়ানী বেটী আছে, কার ঘরে কত দৌলত আছে এসব খবর সে মুঘলানি বেগম মারফৎ শাহ আবদালীর কাছে পৌঁছে দিয়ে ইনাম পেয়েছিল। যেখানে আফগান সিপাহীরা দৌলতের জন্যে বাড়িঘর ভেঙেছে খুঁড়েছে সেখানে সে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটা ভাগ নিয়েছে। মথুরা পর্যন্ত এলাকায় প্রথম দফায় আবদালশাহী পল্টন এসেছে বাঘের সঙ্গে নেকড়ে বাঘের মত; তারা চলে গেলে তার পিছনে এসেছিল নাজিবউদ্দৌলা রোহিলা পল্টন নিয়ে শেয়ালের পালের মত। তাদের মধ্যে মিশে কালাশের ঘুরেছে; বাঘ নেকড়ে শেয়ালের দলের পাশে সে ঘুরত হিন্দুদের শ্মশানের মড়া খাওয়া কুকুরের মত। পচা আধখাওয়া লাশগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো; হাড়ে কঙ্কালে লেগে থাকত যে মাংস তাই চেটে চেটে তুলত।

শ্মশান-কুকুরেরা যেমন চিতার কয়লা নখে করে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখে তেমনি করেই কালাশের ঘুরে ঘুরে দেখত পুড়ে যাওয়া অঞ্চলের ঘরবাড়ির ছাই সরিয়ে পচে যাওয়া মুর্দাগুলিকে নেড়ে চেড়ে। পেতো বইকি কিছু কিছু। কিছু কিছু কেন মধ্যে মধ্যে অসামান্য দুর্লভ বস্তু পেয়েছে। ছাইয়ের মধ্যে পেয়েছে গলে যাওয়া সোনার টুকরো, জহরত; পচা মুর্দার গায়ে থেকে পেয়েছে গয়না; আংটি, হার, কানের আভরণ, নাকের আভরণ। দু একটা পোড়া বাতির মধ্যে অভাবিতভাবে মোহরের হাঁড়িও পেয়েছে। মরা মানুষের পোশাক থেকে পেয়েছে দামী জরি তার সঙ্গে জহরত।

এরপরই সে হল পাকা রকমের কারবারী। লালকিল্লার মীনা-

বাজারে সে খুলে বসল এক দোকান। বেচত সে হরেক রকমের জিনিস। প্রধান ছিল পোশাক। মসলিন রেশম পশম; বানারসের রেশম বাংলার মসলিন কাশ্মীরী শালা পশম; তার সঙ্গে বেচত ফিরিঙ্গীদের তৈরী শরাব কড়া আরক খাঁটি আফিং—আরও হরেক রকমের জরিবুটী সে রাখত। আর কিনত সে বাদশাহের হারেমের এবং বাদশাহের জ্ঞাতগোষ্ঠীর বাড়ির পুরানো পোশাক; যে পোশাক থেকে সে পেত সোনা রুপোর জরি মুক্তা পান্না পোখরাজ হীরার কুচি, যা বসানো থাকত জরিদার নকশার সঙ্গে।

বাদশাহের হারেম থেকে বাদশাহের জ্ঞাতগোষ্ঠী যারা কেল্লার বাইরে চৌক অঞ্চল থেকে বেল্লার আশেপাশে আপন আপন হাবেলীতে থাকত, পুরানো কিল্লাতে থাকত তাদের অবস্থা তখন সাধারণ গৃহস্থীদের থেকেও শোচনীয়। বাদশাহী দপ্তর থেকে তাদের মাসোহারা মিলত না নিয়মমত; মধ্যে মধ্যে রসদ পর্যন্ত আসত না। তারা তখন এই সব পুরানো পোশাক লুকিয়ে রাখা গয়না বের করে বিক্রি করত, কিনত কালাশের।

তাছাড়া বাদশাজাদাদের জোওয়ানীর শখ ছিল। বাঈজীপাড়ায় যাবার জন্যে টাকার দরকার হত!

বেগমদের অনেকের গোপন দান ছিল; দেনাও ছিল।

কালাশের কারবার খুলেছিল এই খরিদ্দারের বাজার নিয়ে। বাদশাহ থেকে উজীর নাজীর আমীর সকলের সঙ্গে তার তখন আলাপ হয়েছে। পুরানো বাদশাহ ছোটা আলমগীরের সে প্রিয়পাত্র ছিল।

বুড়া ছোটো আলমগীর ত শরাব ছুঁতো না আফিং খেতো না, কোরান পড়ত, সব কিছুতে নকল করত আসল আলমগীরকে; কিন্তু বুড়োর ছিল ঔরতের ভুখা। বুড়ো বাদশা হয়েই ক্ষেপেছিল

মহম্মদশাহের বেটী ষোলো বছরের মেয়ে হজরত বেগমকে বিয়ে করবে বলে। শেষ হজরত বেগম বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়ে রেহাই পেয়েছিল। কালাশের হজরত বেগমকে ফেলে দিয়েছিল আমেদশা আবদালীর হাতে। ভারী মজা লেগেছিল কালাশেরের! কালাশের আলমগীর বাদশাকে ছোকরী বাঁদী যুগিয়েছে।

নতুন বাদশাহ শাহ আলমেরও প্রিয়পাত্র সে।

বাদশাহ শাহ আলম শরাব খান না আফিং খান। সে আফিং সে যোগায়।

কড়া তেজী আফিং তার। আফিং ভিন্ন বাদশার নেশা জমে না।

মধ্যে মধ্যে খুবসুরত বাঁদী পেলে বাদশাহের সামনে হাজির করে। বাদশাহকে ঠিক ব্যভিচারী বলা চলে না। বাদশাহ ধর্মের আইন মেনে বেগম রাখেন। সেই আইনমত পরস্তার রাখেন।

আরও একটা কারবার তার আছে। অল্পবয়সী বাদশাজাদাদের সে ছোকরী যুগিয়ে থাকে। বাঈ নয় কসবী নয়। পথে যারা ভিক্ষে করে, গরিব, তাদের মধ্যে ছোকরী দেখে তাদের এনে কিল্লার একটা গোপন অংশে তাদের যোগান দেয়।

পয়সা টাকার জন্যে নয়, এটা ছিল তার শখ তার আমোদ।

বাদশাহী হারেমের নাজীর খোজাসর্দার মনজুর আলির সঙ্গে তার জমাট দোস্তি এই নিয়ে।

*   *   *

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, আমার গুরুর গুরু সিদ্ধ-ফকীর আমাদের সাক্ষাৎ পীর হজরত রহিমশাহের দুটো চোখ ছাড়া আরও একটা চোখ ছিল। সেই চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পেতেন আদমীর ভিতরে যে আসল আদমী তাকে, দুনিয়ার মধ্যে

যে আর এক ত্নুনিয়া আছে সেই ত্নুনিয়াকে ; নিশুত রাতে কি জনহীন নির্জনে শুনতে পেতেন বাতাসের মধ্যে যে কথা ভেসে যায় ভেসে আসে সেই সব কথা। এমন কি দিন আর রাত যে পায়ে পায়ে পায়ে পায়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে এবং সন্ধ্যে থেকে সকালের দিকে চলে তাব আওয়াজও তিনি শুনতে পেতেন।

তিনি গুলবদ্‌নীর মাথার শিয়রে বসে তার কথা শুনছিলেন—গুলবদ্‌নী কথা শেষ করে বললে পাঁজরায় যন্ত্রণা অনুভব করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওই নবাবজাদা তাকে ছুরি মেরেছিল ওই কালাশেরের হুকুমে। সে তখন, খুদা সেরি জান বাঁচাও। হে ভগবান! বলে অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে যেন শুনেছিল দূর থেকে রহিমশা হজরতের গলার আওয়াজ।

হজরত রহিমশা শুনে বলেছিলেন—হাঁ বেটী তোর ওই ডাক আমার কাছে মালিক আল্লাহতায়লা পৌঁছে দিয়ে বলেছিলেন—সাড়া দাও রহিমশা। আমি ঘুমোচ্ছিলাম—উঠে বসেছিলাম। সারা রাত্রি আর ঘুমোইনি। ভোর ভোর উঠে চলে আসছি। বিপদ কেটেছে বেটী। আর ডর নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তোর বুকের ওপর আমার দেওয়া তাবিজ ছিল। সেই তাবিজের জন্যেই ছুরি পাঁজরায় বসবার সময় কলেজার থোড়া পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। ওই তাবিজের জন্যেই বেটী, খুদা ভগবানে তোর মতির জন্যেই কালাশের তোকে খুন করতে বলেছিল নবাবজাদাকে।

নবাবজাদা গোলাম কাদের কালাশেরের কাছে নিজেকে বেচেছে বেটী। তার হুকুম তাকে শুনতেই হবে।

একটুকরো বিচিত্র এবং বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠেছিল হজরতের মুখে। বলেছিলেন—বেটী, শুনে তোর তুখ হল?

চুপ করেই শুয়ে ছিল গুলবদ্‌নী। ওই কটি কথায় সে ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠল। হজরত যেন কথা কয়টার ধাক্কায় ওই পনের ষোল বছরের মেয়েটির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিলেন।

তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হজরত আবার বললেন—মৎ রোও বেটী। কেঁদো না। না না। ভুলে যাও বেটী। ওকে তুমি ভুলে যাও। গোলাম কাদেরকে ভুলে যাও। ওর রূপ যাই হোক—ওর দুরন্তপনা ওর দুঃসাহস যতই হোক—ও নওজোয়ান তোমাকে প্রথম জোয়ানীর স্বাদ দিয়েছে, তা দিয়ে যাক; ওকে তোমাকে ভুলতেই হবে।

গুলবদ্‌নীর চোখের জল কিছুতেই বাগ মানছিল না। হজরতের পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে শুয়েছিল, এবং চোখ থেকে ধারা গড়াচ্ছিল। এ ছাড়া বাবুজী, লেড়কীর সমস্ত শরীরে কোন নড়াচড়া ছিল না, এমন কি শ্বাস পর্যন্ত মালুম হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কি মাখনের মত নরম ফুলের মত খুবসুরত ওই লেড়কী যেন পাথর বনে গিয়েছে।

হজরত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—বেটী, আমার কথা বিশ্বাস কর। 'কালাশের' তো মানুষ নয়—মানুষের দেহে ও হল খুদ্‌ শয়তান।

সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল গুলবদ্‌নী।

গুরু বলেছিলেন—আমি তো ঝুট বলি নে মা। আর তোমরা যা দুনিয়াতে দেখতে পাও না, পয়গম্বর রসুলের মেহেরবানিতে খুদাতায়লার দয়াতে তাও আমি দেখতে পাই। আমি কালাশেরকে দেখেছি। তার ভিতরের শয়তানকে দেখেছি। বেটী, তখন ওর বচপন—একেবারে বাচ্চা ছেলে। ওই কসবীবালীর বাড়িতে ওর তখন ভারী বেমার। মরে মরে। তখনই ও মরল আর শয়তান ওর ভিতরে ঢুকল। দুনিয়াতে শয়তান এমনি করেই এক একটা

মানুষের দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাবুজী, এ নিয়ে তকরার করলে আমি নাচার। তবে এইটুকু বলতে পারি এর থেকে সত্য কথা আর হয় না বাবুজী। এ কথা আমার নয়। খুদ গুরুর গুরু হজরত রহিমশাহ বলে গেছেন।

(আট)

—এক একটা জিন্দিগী আসে বাবুজী যে আমলে মানুষেরা আওয়াজ তোলে—খোদা মুর্দাবাদ ভগবান মুর্দাবাদ। তখন শয়তান শতরঞ্জির ছক পেতে বসে খোদাকে ডেকে বলে—তোমার সঙ্গে শতরঞ্জি খেলব—এস। যে জিতবে দুনিয়া তার।

ফকীর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তোমাদের মহাভারতে এমন এক পাশাখেলা আছে শুনেছি। যে খেলায় শয়তানী জাদুতে গড়া হাড়ের পাশা হুকুম শুনেছিল শয়তানের মুরিদের। হেরে গিয়েছিল ভগবানকে যারা মানে তারা। তুমি জরুর জান বাবুজী।

হেসে বললাম—জরুর জানি।

—এও তাই একরকম বাবুজী। শয়তানের শতরঞ্জির ছক থেকে বাদশা উজীর ফিল ঘোড়া নাও সিপাহী সব ঘুঁটি শয়তানের জাদুতে তৈরী। দুনিয়ার দাবিদারি নিয়ে যে শতরঞ্জি খেলা তার ছক হল এই ধরতির বুক আর ঘুঁটি হল মানুষ। এই মানুষদিকে প্রথম শয়তান কেনে। যেমন বাজারে গিয়ে আমরা বান্দা কিনি বান্দী কিনি বোকরা বোকরী কিনি তেমনিভাবে সে কেনে।

বাবুজী, দিল্লী শহর আর চারপাশের এলাকাই তখন শতরঞ্জির ছক হয়ে উঠেছে। এক দান খেলা উঠছে আবার নতুন দানের খেলার

ঘুঁটি সাজানো হচ্ছে। শয়তান প্রতিদানেই নতুন নতুন ঘুঁটিগুলোকে ছকের উপর এনে বসিয়ে চালাচ্ছে।. নতুন দানের বেলায় গোলাম কাদের নিজেকে বিক্রি করে শয়তানের ঘুঁটি হয়ে উঠেছিল সেই দিনই। সেই দিন সকালেই।

সেই দিন সকালেই বাদশাহের হাত থেকে গোলাম কাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিল এই কালাশের। না হলে বাদশাহ হয়তো গোলাম কাদেরের গদানই নিয়ে বসতেন! নাজিবউদ্দৌলা শাহজাদা আলিগহরের দুশমনি করে শাহজাদাকে এগার বছর দিল্লী ঢুকতে দেয়নি। বাদশাহ আলমগীরকে গাজিউদ্দিন খুন করলে; তক্ত খালি হল; সারা হিন্দুস্তান জানলে বাদশাহ হলেন শাহজাদা আলিগহর; তাঁর নাম হল শাহ আলম। কিন্তু তক্ত খালি রইল। বাদশা রইলেন এলাহাবাদ কেল্লায়। ফিরিঙ্গীর সিপাইরা তাঁকে পাহারা দেবার নাম করে ঘিরে আটকেও রইল। ওদিকে মীরবক্সী নাজিবউদ্দৌলা দিল্লী দখল করে বসে রইল; বাদশাহের মা জিনতমহল, বাদশাহের ছেলে জোয়ানভক্তকে দিল্লীতে নজরবন্দী করে রাখলে; কিন্তু বাদশাহ শাহ আলম ঢুকতে পেলেন না দিল্লী। দেয়নি ঢুকতে নাজিবউদ্দৌলা—গোলাম কাদেরের বাবার বাবা।

নাজিবউদ্দৌলা দুর্দান্ত রোহিলা আফগান। শাহ আলম দিল্লীর তক্তে বসে কাফের বর্গী আর জাঠদের ডেকে এনে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে বলে সন্দেহ ছিল তার। আর উজীর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার তাঁবেদারীর কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখত না। উজীর সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে বক্সার গিয়ে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াইয়ে হেরেছে। উজীর সুজাউদ্দৌলার কথায় উঠছে বসছে। সেই সুজাউদ্দৌলা রোহিলা আফগানদের সব থেকে বড় দুশমন। সুতরাং নাজিবউদ্দৌলা শাহ আলমকে দিল্লী ঢুকতে দেয়নি।

দীর্ঘ এগার বছর পর খবর এল নাজিবউদ্দৌলা 'গুজর' গেলেন।

বাদশা শাহ আলম তখন এলাহাবাদ কিল্লায় বাস করছেন। খুশী হয়েছিলেন বাদশাহ। যাক এবার দিল্লী যাবেন যেতে পারবেন। তিনি নাজিবউদ্দৌলার ছেলে জবিতা খাঁকে মীরবক্সীর নোকরীনামা তার সঙ্গে দামী পোশাক পাঠিয়ে বলেছিলেন—মীরবক্সী হলে তুমি, এবার তোমার বাদশাহের দিল্লী যাবার বন্দোবস্ত করো।

খান-ই-খানান জবিতা খাঁ নাজিবউদ্দৌলার পরে বাদশাহের মীরবক্সী। রোহিলখণ্ডে সাহারানপুর নাজিবাবাদ গড় ঘাউসগড় গড় পাথলগড় থেকে মীরাট আলিগড় পর্যন্ত বাদশাহী খাস মুল্কের জায়গীর মনসবভোগী জবিতা খাঁ—শহর দিল্লীর মালিক হয়ে বসে আছে জবিতা খাঁ—সে বাহালী খতখানা নিয়েছিল মীরবক্সীর পোশাকও নিয়েছিল। পোশাকটা পরে কয়েকটা তোপও দেগেছিল কেল্লার বুরুজ থেকে। তারপর বাদশাহের লোককে গিধ্বড় উল্লুক বলে মজা মুস্করা করে তাড়িয়ে দিয়েছিল দিল্লী থেকে।

হিন্দুস্তানের নতুন মীরবক্সী খান-ই-খানান জবিতা খানের সে কাছাইরীতে 'কালাশের' উপস্থিত ছিল। সে সাবাস দিয়েছিল খান-ই-খানানকে। জবিতা খাঁকে কালাশেরের ভাল লাগত। জবিতা খাঁ নামে মুসলমান কিন্তু কাজে সে কোন ধরমকে মানত না। পয়গম্বর রসুল এমন কি খুদাতায়লার নাম নিয়ে ঝুটা বলতে তার বাধত না। ভালবাসত শরাব ভালবাসত ঔরৎ; তার সঙ্গে খেতো আফিং। কালাশের তাকে এই তিন ফরমায়েশ মিটিয়ে যেতো। বাবুসাহেব, জবিতা খাঁ বাদশাহের বহেন খয়রুন্নিসা বেগমের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কালাশের মনজুর আলি তাকে সুবিধা করে দিয়েছিল। কিন্তু এর পরই দান উলটে গেল।

—বাবুজী, কিতাবে তুমি নিশ্চয় পড়েছ যে এবার পাশার দান উল্‌ট্ গিয়েছিল। জবিতা খাঁ বেচারা বাদশাহের দূতের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করেনি। এর ফল হয়েছিল উলটো।

বাদশাহ শাহ আলম কড়া আফিং খেয়ে বেগমমহলে বসে যখন আপসোস করছিল—আর কখনও বা বলছিল আমি এবার নিজের হাতেই খুন হয়ে যাব নয়তো জওহর খাব আর বেগমরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তখনই একজন বান্দা এসে খবর দিয়েছিল মারাঠা মুল্ক এর সিন্ধে মহারাজের কাছ থেকে চিঠ্‌ঠি নিয়ে এক সওয়ার এসেছে। সে চিঠ্‌ঠি খুদ বাদশাহ ছাড়া আর কারু হাতে দেবে না। হুকুম নেই। মাহাদজী সিন্ধিয়া! মারাঠা এলাকায় মাহাদজী সিন্ধিয়া সব থেকে ছিল শক্তিমান বাবুজী। বাদশাহ বান্দার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কি লিখেছে সিন্ধিয়া? কি লিখতে পারে?

টাকা? এই এলাহাবাদ কেল্লায় তাকে একান্ত অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার কাছে টাকা দাবি করেছে?

বিশ্বাস তো নেই! হায় নসীব! হায় কিসমৎ! হায় দিল্লীর বাদশাহী।

তবু ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই। ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কে এসেছে নিশান নিয়ে?

—এক মারাঠা ব্রাহমণ। রামজী রাও।

—কে সে? মারাঠা দরবারে কি মাহাদজী সিন্ধিয়ার দপ্তরে কোন কাম করে? ছোট নোকর? না বড় নোকর কেউ?

—আমীর আদমী জাঁহাপনা।

—হুঁ। খান-ই-খানান হাসমউদ্দিন সাহেবকে খবর দাও, নজফ কুলিকেও খবর দাও। সৈফুদ্দিনকেও খবর দাও।

—জাঁহাপনা, ব্রাহমণ রাওসাহেব বলছেন তিনি গোপনে চিঠি আপনার হাতে দেবেন। থাকতে থাকবে শুধু আপনার দেহরক্ষী।

—মিরজা নজফ খাঁকে ডাকো। সেই থাকবে আমার দেহরক্ষী হয়ে।

খুদা মেহেরবান, পয়গম্বর রসুলের অযাচিত করুণা, মাহাদজী সিন্ধিয়া টকা দাবি করে নাই, কোন বদমতলব করে খত সে লেখেনি। সে বাদশাহকে লিখেছিল—"দিল্লীর বাদশাহের বাদশাহী হিন্দুস্তানের কোন লোক অস্বীকার করে না। হিন্দুস্থানের হিন্দুরা শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ জালালউদ্দিন আকবরশাহকে বলত জগদীশ্বরের প্রতিনিধি, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। মারাঠারা বাদশাহের দুশমনকেই হঠাতে চায়। বাদশাহকে তারা শ্রদ্ধা করে—তারা তাঁকে সারা হিন্দুস্তানের মালিক বলে মানে। যতদিন বাদশাহ হিন্দু এবং মুসলমানকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন ততদিন তাদের কোন প্রতিবাদ নাই।

"বাদশাহকে সাহায্য করবার জন্যই বর্গী সৈন্য নিয়ে আমরা উত্তর ভারতে ছাউনি গেড়ে বসে আছি।

"আফগানিস্তানের আফগানেরা বাদশাহী মুল্ক দখল করেছে, রোহিলখণ্ডের পাঠানেরা বাদশাহী খাস ইলাকা দখল করে আছে, বাদশাহ হিন্দুস্তানের মালিককে দিল্লীতে ঢুকতে দেয় না—এ বর্গীরা বরদাস্ত করতে পারে না।

"জাঁহাপনা মালিক হয়েও আজ এক যুগ দিল্লী থেকে অপরাধীর মত নির্বাসিত হয়ে রয়েছেন। এক রোহিলা পাঠানেরা ছাড়া হিন্দুস্তানের কেউ এ পছন্দ করে না—এ তারা বরদাস্ত করতে পারছে না। মালিক ছাড়া মুল্ক—সে মুল্কের কোন ইজ্জৎ নেই। এ হিন্দুস্তানের মানুষের কাছে লজ্জার কথা।

"আমি মারাঠা ফৌজ নিয়ে শাহানশাহকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে তখ্‌ত্‌নাসীন করতে তৈয়ার আছি।

"শাহ-ইন-শাহের সম্মতি পেলেই এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লী দখল করবে বর্গী ফৌজ বাদশাহের নামে। তারপর বাদশাহকে আমরা

নিয়ে গিয়ে দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়ে সকল কাজে বাদশাহের সাহায্য করব।"

বাদশাহ বলেছিলেন—ইয়া খুদা মেহেরবান!

মাহাদজী সিন্ধে মিথ্যে আস্ফালন করেনি। সে সাত দিনের মধ্যে না হোক বাদশাহের সম্মতি পাওয়ামাত্র দিনকয়েকের মধ্যে দিল্লী দখল করে লালকিল্লা থেকে রোহিলাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্গী ফৌজ আর এক দফা দিল্লী লুঠ করলেও দিল্লীর বাসিন্দারা বলেছিল—এও ভাল। এবার বাদশা আসবেন। বাদশাহ এলে দিল্লীর নসীব ফিরবে। মালিক না থাকলে মুল্কের দাম কিছু নেই। বেওয়া ঔরৎ বিধবা মেয়ে আর মালিকহীন মুল্ক দুইয়ে কোন ফরক নেই।

দিল্লী এতদিন স্বামীপরিত্যক্তা মেয়ের মত ম্লানমুখী মলিন-বসনা হয়ে ছিল। এবার দিল্লীর মালিক ফিরছে—এবার সে সাজবে, পেশোয়াজ পরবে. কাঁচুলি গায়ে দেবে, ওড়না চড়াবে. কেশবন্ধন করবে, সিঁথিতে সিঁথিপাটী পরবে—নীলা মুক্তা হীরা পোখরাজ ঝলমল করবে। পায়ে পরবে পাঁয়জোর. হাতে পরবে কঙ্কণ বাজু-বন্ধ—হাতে বীণা নিয়ে গীত শুনাবে মালিককে।

দিল্লীর লোকেরা খুশী হয়ে উঠেছিল। কালাশেরের তাতে কিছু এসে যায়নি। জবিতা খাঁ গেল, শাহ আলম আসছে বাদশাহ হয়ে—সে বাদশাহীতে তার আমল বজায় থাকলেই হল। তার কদর থাকলেই হল। সে বাদশাহকে খুশী করবার জন্য তৈয়ার হল। কড়া আফিং যোগাড় করে রাখলে। আর ভাল ঔরৎ খুঁজতে লাগল যে ভাল গীত গাইতে পারে।

• • •

বাবুজী. কালাশেরের ভাবনা বিশেষ ছিল না।

কিসের ভাবনা তার? হিন্দুস্তান জাহান্নামে চলেছিল এ তো ঠিক। জাহান্নামেই কালাশেরের জায়গীর। জায়গীর কেন তার সাম্রাজ্য।

সে দিল্লী থেকে এগিয়ে গিয়েছিল দিল্লীর মারাঠা ফৌজ আর লালকিল্লার খাস বাদশাহী সিপাহীদের দলের সঙ্গে। সে দলের সঙ্গে ছিল শাহজাদা জোয়ানভক্ত আবদুল আহাদ আর কালাশেরের দোস্ত বাদশাহী হারেমের নাজির খোজাসর্দার মনজুর আলি সাহেব।

ওদিকে বাদশাহ সরাসরি এলাহাবাদ থেকে দিল্লী রওনা হয়ে পথে ডাইনা তরফ ভাঙলেন। উত্তর-পশ্চিমে ফারাক্কাবাদ। আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের ফারাক্কাবাদ। বাঙ্গাশ এই এগার বছর বাদশাহী খাজানা দেয়নি। আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের ইন্‌তেকাল হয়েছে, বাদশাহী কানুন মত তার সব সম্পত্তি সম্পদ বাদশাহের—বাদশাহ তার জন্যে একটা নজরখানা পান—খারিজান নজরানা; সে নজরানা বাঙ্গাশের ছেলে দেয়নি। বাদশাহ সেই খাজানা আদায়ের জন্য ঘুরলেন। তখন বাদশাহী কিসমতে জলুসের পালা এসেছে।

সিন্ধিয়ার ফৌজ ছাড়া বাদশাহী ফৌজের প্রধান মির্জা নজফ আলি আরও সিপাহী পল্টন যোগাড় করেছে। তা ছাড়া তুকোজী হোলকার এসেছে তার ফৌজ নিয়ে, তার সঙ্গে এসেছে বিশ্বজীকৃষ্ণ। লক্ষ্ণৌএর নবাবও ফৌজ দিয়েছে সঙ্গে। বাদশাহী ফৌজ ফারাক্কাবাদে বাঙ্গাশ নবাবের কাছে পাওনা আদায় করে দিল্লীর মুখে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না।

বাদশাহ হুকুম দিলেন—চলো রোহিলখণ্ড। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে তবে দিল্লী ঢুকব।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, কালাশেরের মেজাজ খুশ

ছিল লড়াইয়ের জন্যে। লড়াই হচ্ছে আদমী মরছে; খুন ঝরছে; মাটি ভিজছে; একদল বাঘের মত হাঁক ছাড়ছে আর একদল ঘাড়-ভাঙা হরিণের মত পড়ে কাতরাচ্ছে, বাকী সব ছুটে পালাচ্ছে। যারা জিতছে তারা শহরে গিয়ে ঢুকছে—ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে—টাকা-পয়সা লুঠ করছে; জোওয়ানী সুরতওয়ালী ঔরৎ দেখছে তো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে; তার গায়ের কাপড় টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে; মুখে হাত চাপা দিয়ে তার চিৎকার বন্ধ করে তাকে ভোগ করে ছেড়ে দিচ্ছে। তারা কাঁদছে—এয় আল্লা! এয় খোদা! হে ভগবান! হে রাম! হে গোবিনজী! কালাশেরের তত আনন্দ এতে।

একে একে জবিতা খাঁয়ের ঘাঁটি পড়তে লাগল।

সুকরতাল পড়ল।

জবিতা খাঁ একটা হাতী নিয়ে স্রিফ চল্লিশ সওয়ার সঙ্গে নিয়ে পালাল। বাকী বিলকুল বাদশাহী ফৌজের কাছে ধরা পড়ল।

কালাশের এ সুযোগ ছাড়লে না, সে গুজরদের যোগাড় করে লুঠলে পোড়ালে সুকরতাল।

বাদশাহী ফৌজ মারাঠা ফৌজ ছুটল পাথলগড়ের মুখে। পাথলগড় পাথরের কেল্লা। সে কেল্লাও পড়ল।

দু পুরুষের মজুত দৌলত আর তামাম রোহিলা পাঠান আমীরদের ছেলে মেয়ে মা বহেন জরু ধরা পড়ে গেল।

বাদশাহী ফৌজী লোকেরা তাদের হাতে ধরে টেনে বের করে নিয়ে গেল তাদের তাঁবুতে। তার সঙ্গে ধরা পড়ল জবিতা খাঁয়ের বেগম আর বেটা; সেই ছেলে এই গোলাম কাদের।

—বাবুজী! ফকীরসাহেব বললেন।—বাবুজী, কালাশের এই খবর শুনে ছুটে গিয়েছিল পাথলগড়।

লুঠ! লুঠ চলছে সেখানে! রোহিলা আমীরেরা আমীরদের

জেনানীরা কাঠের বাক্সে লোহার বাক্সে হীরা জহরত পুরে তার সঙ্গে ইট পাথর ভরে ফেলে দিয়েছে 'গড়খাইয়ের' জলে। ডুবুরী দিয়ে সেই সব বাক্স ওঠানো হচ্ছে। আর আমীরদের বেটী বহেন জরু জেনানী কয়েদ হয়েছে বাদশাহী তাঁবুতে।

এ খবরের পর বাবুজী কালাশের কি বসে থাকতে পারে? সে ছুটে গেল।

হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ফকীর —হজরত রহিমশা বলতেন, দিল্লী থেকে সে যে এত দূর এসেছিল বাবুজী সে এসেছিল এরই জন্যে! বাদশাহকে খুশী করবার জন্যে ঠিক নয়। শয়তান যখন খেল শুরু করে তার আগে নকশা ছকে নেয় বাবুজী! শতরঞ্জ খেলার কিস্তির পর কিস্তির ছকে ফেলে সে যা ঘটাতে চায় তাই ঘটায়।

কালাশের তাই ভেবেছিল। বহুৎ খুশী হয়ে ছুটে দেখতে গিয়েছিল কেমনভাবে দৌলত লুট হচ্ছে, শহর পুড়ছে, দেহাত পুড়ছে, আওরৎ ছিনিয়ে নিচ্ছে—জবরদস্তি লুটে নিচ্ছে ঔরতের জিন্দিগীর যথাসর্বস্ব। মায়ের সামনে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে টেনে ফেলে দিচ্ছে—বাপের কাছ থেকে বেটী কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে; মরদের কাছ থেকে তার জেনানী নিয়ে যাচ্ছে; বাপ বুক চাপড়াচ্ছে; স্বামী মাথা ঠুকছে; মেয়েরা চিৎকার করছে—খুদা বাচাও! ভগবান বাচাও। যারা কেড়ে নিচ্ছে তারা হাসছে।

তার সঙ্গে সেও হাসবে, এই মতলব নিয়েই সে ছুটে গিয়েছিল পাত্থলগড়।

দু চারটে বহুৎ খুবসুরত নওজোওয়ানী যোগাড় করবারও মতলব ছিল। শাহ আলম বাদশাহ ধর্ম মেনে চলত কিন্তু তার পরস্তারে ঝোঁক ছিল।

আর ওই কিল্লার 'গড়খাতে'র মধ্যে ফেলা কৌটাবন্দী হীরা

জহরতে তার লোভও ছিল। কিন্তু সব থেকে বড় লোভ সে ওই দেখে আমোদ পাবে।

গিয়ে সে দেখলে এক বুড়ী ঝাড়ুদারনী ডোমনীকে। পাত্থলগড় ঢুকতেই সে দেখলে, তখন সকালবেলা বাবুজী—দেখলে এক বুড়ী ডোমনী ময়লার গামলা মাথায় করে বেরিয়ে আসছে শহর থেকে।

আপনমনে বোধহয় আপনাকেই শুনিয়ে বলছে—খুদাসে বড়া মেহেরবান 'নেহি হ্যায়—পয়গম্বরসে বড়া কদরদান নেহি হ্যায়। ভগবান থেকে বড় বিচার করনেবালা নাই। কখনও যেন বিশ্বাস না হারাই। যদি হারাই তবে আমার মাথায় বিনা মেঘে তুমি বিজলি ফেলে দিয়ো। আমাকে পুড়িয়ে ঝলসে দিয়ো!

ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরে কালাশের বলেছিল—কিরে বুঢ্ঢী খুদা তোকে কি মেহেরবানি করলে? অাঁ? তোর মাথায় ওই ময়লার গামলা তুলে দিলে? তোর কোন্ কদর করলে সে? গড়খাত থেকে জহরতভরা কৌটো পেয়ে গেছিস বুঝি? তাহলে আমাকে দে—আমি তোকে ঠিক ন্যায্য দাম দেব।

বুড়ী থমকে দাঁড়িয়ে বললে—নেহি আমীর জনাবআলি খান-ই-খানান আমীরউল, ওসব নয়। জবরদস্ত লুঠেরা রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলার বেগমরা আজ পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, ওদের হারেমের ছোকরীদের হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাদশাহী সিপাহীরা—সেই দেখে আমার দিল খুশিতে ভরে গিয়েছে গরিব পরবর অন্নদাতা। তাই খুদাকে বলছি তোমার থেকে মেহেরবান নেই, তোমার থেকে বিচারক নেই।

ঘোড়াটা চালিয়ে আরও দু কদম এগিয়ে এল কালাশের। মন যেন পিছনে চলে যাচ্ছে। কি যেন কাকে যেন মনে হচ্ছে। কাকে মনে হচ্ছে তা ঠাওর হচ্ছে না—তবু মনে হচ্ছে এর কথার মধ্যে এর এই বার্ধক্যজীর্ণ দেহের মধ্যে চেনা কেউ যেন লুকিয়ে আছে।

বুড়ীকে দেখে মনে হয় না এ ডোমনী কি ঝাড়ুদারনী। এককালে এর রূপ ছিল; এখন দাঁত ভেঙেছে দেহের মুখের চামড়া কুঁচকেছে চুল সফেদ হয়েছে। যেন একটা বুড়ো গোলাপের গাছ কি কাঞ্চনফুলের গাছ, গাঁটে গাঁটে ভর্তি হয়ে উঠেছে—নতুন ডাল নেই কচি পাতা নেই কুঁড়ি নেই ফুল নেই। বাতাসে ভাল করে দুলতেও পারে না। কিন্তু কে?

আওরত সে অনেক দেখেছে। খুবসুরত আওরত নিয়ে তার কারবার। বুড়ো হয়ে যাওয়া খুবসুরত আওরতও সে অনেক দেখেছে। মহম্মদশাহ বাদশাহের বেওয়া বেগম মালকাইজমানি সাহেবাই-মহলকে দেখেছে। আলমগীর বাদশাহের বেগম এই বাদশাহের মা জিনতমহলকেও দেখেছে—এ মেয়ে অনেকট্রা সেই রকমের। এককালে সুরত ছিল অনেক।

তার নীরবতা লক্ষ্য করে বুড়ী বললে—সালাম জনাবআলি। চলি আমি হুজুর। মাথায় ময়লার গামলা; বদ বয় উঠছে; আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বে-আদবী হবে। আপনি যান না, দেখুন না, বড়ী নবাবের বড়ী বেগম আজ খুদাকে ডাকছে। বলছে বাচাও। বিচার করো। মাথার বুরখা খুলে গেছে। চোখে আঁসু ঝরছে গঙ্গা যমুনার মত। হুজুরআলি, একদিন আমারও ঝরেছিল —ঝরিয়েছিল ওই বড়ী বেগম। তাই বলছি। আজ আমি ডোমনী হয়ে গেছি। কিন্তু ডোমনী তো আমি নই। জনাব, আমি ছত্রির ঘরের লেড়কী—আজও আমার সুরতের যেটুকু আছে তাতে যে দেখবে সেই বলবে আমি ডোমনী নই। বোলিয়ে হুজুর আলি আপ বোলিয়ে!

একটু বিষণ্ণ হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। বললে—জনাব-আলি, শুধু সুরত নয় এককালে দিল্লীর মতিবাঈয়ের ঠুংরী শুনবার জন্যে আমীর-উল-উমরারা মাইফেল বসাতো শখ করে।

নসীব জনাবআলি নসীব! খুদার বিচার। আজ আমি ময়লার গামলা বয়ে বেড়াচ্ছি।

চমকে উঠেছিল কালাশেরের মত ঠাণ্ডামেজাজবালা শয়তান। ঘোড়াটার উপর থেকে নেমে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল—উ তো মর গয়ি! দিল্লী কসবী-মহল্লার মতিবিবি—ঠুংরী গাইত—সে তো নাদিরশাহী দোজখের সময়—

—আপনি তাকে জানতেন জনাবআলি?

—নাম শুনেছিলাম। সে তো মরে গেছে।

—না জনাব। আমি মরিনি আমি লুঠ হয়েছিলাম। ইরানীরা লুঠ করেছিল। জনাবআলি, বেঁচেছিলাম গানের জন্যে। নাচের জন্যে। জনাবআলি, ইরানীদের তাঁবুতে সারারাত রেহাই ছিল না—আগুন জ্বেলে তার সামনে গান গেয়েছি নেচেছি। একদিন এই রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা আমার নাচগান শুনে আমাকে সিপাহীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। জনাব, নসীবকে বহুত বহুত সালামত দিয়েছিলাম যে বেঁচে গেলাম। হুজুর, এই নবাবকে বলেছিলাম—জনাবআলি তুমি আমার সব। আমার পয়গম্বর তুমি—আমার খুদা তুমি—আমার মালিক তুমি—আমার অন্নদাতা তুমি। মেহেরবান তুমি যদি কখনও বাঁদীর উপর নারাজ হও তবে মেরে ফেলো আমাকে। কিন্তু পথে ফেলে দিয়ো না। কিন্তু তাই করলে নবাব। না—তার থেকেও ছোটা কাম করলে। আমাকে দিয়ে দিলে এক ডোমকে। এক ঝাড়ুদারকে। জনাবআলি, কসুর ছিল। কিন্তু সে কসুর আমার নয়। আমি কি করব—আমি তো কসবী আমি তো বাঁদী! নবাবজাদা জবিতা খাঁ আমার উপর নজর দিলে। আমি কি করব? সেই কসুরের জন্যে আমাকে দিলে ডোমের হাতে। এই পাথলগড়ে আমি ঝাড়ুদারনীর কাম করেছি

আর এতদিন ধরে খুদাকে সেকায়েৎ করেছি গাল দিয়েছি। আজ খুদাকে বলছি মেহেরবান। ময়লার ঝুড়ি মাথায় করেও বলছি এ আমার যোগ্য সাজা তুমি দিয়েছ। আমার গুনাহ তো কম নয়। আমার গুনাহ মেপে শেষ করা যায় না। জনাবআলি, হিন্দু ঘরের বিধবা মেয়ে—বাপের রক্ষিতার ছেলে—সে আমার বলতে গেলে ভাই—জোওয়ানির জ্বালায় তারই সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম। এ সাজা আমার ঠিক সাজা। কিন্তু যে গুনাহের জন্যে নবাব আমাকে ডোমের হাতে দিয়ে সারা জিন্দিগীর মত ময়লার ঝুড়ি তুলে দিলে সে গুনাহ তো আমার নয়। সে গুনাহ নবাবজাদার। এখনকার নবাব জবিতা খাঁয়ের। তার বিচার আজ যখন নিজের চোখে দেখলাম তখন খুদাকে মেহেরবান কদরদান দুনিয়ার সব থেকে বড় বিচারকরনেবালা বলছি!

ফকীর বললেন—বাবুজী, শয়তানের বানানো নকশার ছক ধরেই ময়লা মাথায় এই ডোমনী এসে দাঁড়াল কালাশেরের চোখের সামনে। কালাশের পাথর বনে গেল। তার মুখে কোন জবাব বের হল না। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল। বাবুজী, এ ডোমনী—এককালের মতিবিবি—সে হল কালাশেরের মা।

—সালাম! বহুৎ বহুৎ সালাম খোদাবন্দ! আপনার হুকুম হলে আমি চলি!

উত্তর দিতে পারলে না কালাশের। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়ার লাগাম ধরে।

বুড়ী চলে গেল।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল কালাশের। তাকিয়ে দেখলে বুড়ী ওই চলছে। সদর রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথে চলছে। ঝুড়ির ময়লা

ফেলতে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে সে চড়ে বসল তার ঘোড়ায়। ঘোড়াটাকে ছোটালে মাঠের পথে।

বুড়ীর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। বললে—বুড়িয়া, এ জিন্দিগী তোর কেমন লাগছে? তিতা না মিঠা?

বুড়ী তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললে—এ বাত কেন বলছ হুজুরআলি?

—তোর আজও বাঁচতে সাধ আছে?

—সাধ নেই হুজুর কিন্তু মরতে যে বড় ভয় জনাব!

—সে ভয় আমি তোর ঘুচিয়ে দেব।

—নেহি খোদাবন্দ! নেহি নেহি। হুজুর, মরতে আমি পারব না।

—তোর একটা লেড়কা ছিল?

অবাক হয়ে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কালাশের বললে—তুই নাম রেখেছিলি শের খাঁ। দিল্লীর কসবী মোকামবালী বলত 'কালাশের'। কসবীপাড়ায় সে কালাশেরই হয়ে গিয়েছিল।

—তুমি—তুমি সেই কালাশের?

—আমি তোর মরণের ভয় ঘুচিয়ে দোব।

—তুই আমার সেই বাচ্চন—আমার শের খাঁ!—বুড়ীর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল।—তুই আজ আমীর বনে গেছিস বেটা! খোদা মেহেরবান বহুত মেহেরবানি তোমার!

বলতে বলতে তার হাত যে কখন অবশ হয়ে গিয়েছিল সে জানতে পারেনি। ময়লার ঝুড়িটা খসে পড়ে গিয়েছিল—ময়লায় তার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছিল। সে এক বীভৎস মূর্তি।

কালাশেবেব মা হয়ে তার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ডেকেছিল —আমাব বেটা আমার শের খাঁ!

কালাশেরেব তলোয়ার তাব বুকে বিঁধে গিয়েছিল মুহূর্তে।

কালাশের বলেছিল—ভয় করিসনে। মা কোন ভয় নেই। কিন্তু দোহাই খোদাব নাম নিসনে।

ছটফট করেছিল বুড়ী। সে ছটফটানি কালাশেব দাঁড়িয়ে দেখেছিল। বাবংবাব জিজ্ঞাসা কবেছিল—বল্ কোন সাধ থাকলে বল্, বলে যা আমাকে। বল্।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—বাবুসাহেব, শয়তান দোস্তি কবে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে ছুরি মারতে পারে। খুদা যখন বঞ্জ হয়ে ওঠেন তখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়। নাদেরশা আমেদশা ফৌজ নিয়ে এসে লড়াই কবে লাখো আদমী মারে। খুদা রঞ্জ হয়ে একদিকে ধর্‌তিকে কাঁপিয়ে দেয় তো বড় বড় শহর তাসের ঘরের মত শুয়ে যায়; লাখো লাখো আদমী ঘব চাপা পড়ে মরে—ধরতির ফাটলে কোথায় হারিয়ে যায়।

শয়তান বেওকুফ বনে যায়।

বেওকুফ বনে কিন্তু হার মানে না।

(নয়)

ফকীরসাহেবের এ দর্শন পুবনো কালের বিশ্বাস; এর সঙ্গে পরিচয় অল্পবিস্তর একাল পর্যন্ত প্রায় সকল লোকেরই আছে। মানুক বা না মানুক এ ধরনের অনেক ব্যাখ্যা শুনেছে। শুনে নতুন কালের মানুষেরা হাসে। হাসিরই কথা। খুদা আর শয়তানের যুদ্ধের কথা অবাস্তব হলেও ভালো আর মন্দের যুদ্ধের কথা কেউ

অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভালই বা কোন্‌টা আর মন্দই বা কোন্‌টা এ নিয়ে তকরার ওঠে। সে থাক।

ইতিহাসের কালে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হল শাহ্ আলমের বাদশাহী।

বাদশাহী তখন ফাটলধরা মজা দীঘির পঙ্কশয্যার মত। মানুষের অজ্ঞতা, অন্ধতা, ধর্মের গোঁড়ামি, বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষ. ন্যায়ে নীতিতে বিশ্বাসহীনতা সারা ভারতবর্ষকে নামিয়ে দিয়েছিল আকণ্ঠগভীর ওই পঙ্কআস্তরণের মধ্যে।

হয়তো ভারতবর্ষের মধ্যযুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই ছিল এই। কিছুক্ষণ আগে ফকীরসাহেব একটা ভারী ভাল কথা বলে-ছিলেন। দুই আর দুইয়ে চার এক আর তিনে চার এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু এক এক এক আর এক জুড়ে চারের হিসাবটাই সব থেকে বড় সত্য বেশী সত্য। চমৎকার কথা। মুঘল সাম্রাজ্যের ওই সময়ের অবস্থার যে বর্ণনা ফকীরসাহেব দিলেন সেইটেই এক এক এক আর একে চারের মতই সত্য।

কালাশেরের মত কোন অপবিত্র-জন্ম কুৎসিত দেহ ও মনকে আশ্রয় করে খুদ শয়তান সে সময় ঘুরে বেড়িয়েছিল এ কথা স্বীকার না করলেও বা সে না ঘুরে বেড়ালেও ঠিক যা ঘটেছে তাই ঘটত।

তার সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে সেই কালের গন্ধর্বী আর বাঈ তওয়াইফদের গুরু হজরত রহিমশাহের এ সবই দিব্য দৃষ্টিতে দেখা সেকালে এক আশ্চর্য সত্য।

এ সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের চেয়েও বড় সত্য। শুধু রহিমশাহই নন সেকালের আরও অনেকজনে এ সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

*　　*　　*

ফকীরসাহেবই কথাটা অন্যভাবে আমাকে বলেছিলেন। জুন

মাস তখন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজীর শেষকৃত্য হয়ে গেছে কিন্তু আকাশে-বাতাসে তখনও তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সাড়া মিলিয়ে যায়নি।

এ-কাল সে-কাল নয়। সাম্রাজ্যবাদ নয় গণতন্ত্রবাদের কাল। একালে সেকালের শয়তান নেই, ঈশ্বর বা খুদা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি এ সত্য আশ্চর্যভাবে সেকালের মতই সত্য হয়ে আছে। এক একটি রাজনৈতিক দলের এক একটি আদর্শ আছে তার ঝাণ্ডার সঙ্গে দাঁড়িয়ে; এক দলের আদর্শের সঙ্গে অন্য দলের আদর্শের পার্থক্যও আছে তবুও আদর্শের চেয়ে দলাদলিটা বড়। মানুষের কল্যাণের চেয়ে পরস্পরের হিংসেটাই বড় তাতে সন্দেহ নেই।

ফকীরসাহেবের মত চোখ থাকলে অনায়াসে শয়তান এবং শয়তানিকে খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু সে থাক। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে ফকীরসাহেবের গল্পের মধ্যে ইতিহাসের এদিক ওদিক হয়নি।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, বুড়ীর কবর হয়নি। তাকে কেউ পোড়ায়ওনি; তাকে শেয়াল শকুনেও খায়নি। তখন মুর্দা তো চারিদিকে বাবুসাহেব। লড়াই হয়ে গেছে। মানুষ মরেছে। পড়ে আছে, কিছু গোর দেওয়া হয়েছে। মারাঠারা নিজেদের মুর্দা নিয়ে কিছু পুড়িয়েছে বাকী তো পড়ে আছে। এ বুড়ীটার গর্দামাখা দেহ খেলে একটা কুত্তা। কোথা থেকে এল একটা কালোরঙের কুত্তা —চোখ দুটো তার খয়রা রঙের, রাত্রের অন্ধকারে জ্বলে; আর চোখ দুটোকে ঘিরে দুটো সাদা রঙের ঘের। দেখলে গা ছমছম করে। ডাক ছাড়ে যখন তখন সাধারণ মানুষের প্রাণ চমকে ওঠে।

কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বাঁধলে কালাশের। সে ওই দেহটা দেখতে যেত। কুকুরটাকে বেঁধে ফিরবার সময় বললে—মনে রাখব তোর

কথা। গোলাম কাদের তোকে দুটো দশটা মিষ্টি কথা বলেছে—তার উপকার আমি করব।

বুড়ী মরবার সময় বলেছিল—বলবার কথা কিছু নাই আমার। তবে জবিতা খাঁয়ের ছেলে গোলাম কাদের আমাকে দু দশটা মিঠা বাত বলত কালাশের; সে দেখলাম বাদশাহী ফৌজের হাতে গিরিপ্‌তার হয়েছে। তুমি দেখো বেটা তাকে একটু দেখো।

*　　　•　　　*

বুড়ীর কথা রেখেছিল কালাশের।

লালকেল্লার নাজির খোজাসর্দার তার দোস্ত মনজুর আলির হাতে গোলাম কাদেরকে দিয়ে বলেছিল—আলিসাহেব, জবিতা খাঁয়ের এই বাচ্চাটাকে তোমার ধরমবেটা করে নাও। বাদশাহ জবিতা খাঁয়ের উপর চটে আছে। দিল্লীর মুঘলিয়া আমীরেরা রোহিলাদের উপর খুশী নয়। উজীর আবদুল আহাদও রোহিলাদের উপর বহুৎ অখুশী। হিন্দুস্তানে এসে বাস করেছে কিন্তু হিন্দুস্তানের উপর কোন দরদ নেই। আফগানিস্তানের আফগানেরা তাদের আপন। কাবুলের বাদশা তাদের বাদশা। হিন্দুস্তানের নিমক খেয়েও তারা সে নিমকের ধার ধারে না।

বাদশাহ পাথলগড় দখল করার পর জবিতা খাঁ বাদশাহের কাছে হার মেনে স্বীকার করেছিল সে তার খাজনা নিয়মিত পাঠাবে; বাদশাহী হুকুম তামিল করবে; বাদশাহের দরবারে তার প্রতিনিধি হিসেবে থাকবে তার বেটা গোলাম কাদের। নাজিবাবাদের নবাব নাজিবউদ্দৌলা বাদশাহের মীরবক্সীর প্রতিনিধি হিসেবেও বটে আবার তার জামিন হিসেবেও বটে।

ফকীর বললেন—বাবুজী, বাদশাহ শাহ আলম ছিল বড় কৃপণ—বহুৎ ভারী কঞ্জুস। নেশা ছিল স্রিফ আফিং। জেনানীতে ঝোক মরদ হলেই থাকে বাবুসাহেব—তবে তাকে যারা নিজের কব্জায়

আনতে পারে তারা সাধু আর সন্ত ফকীর আর দরবেশ। ঝোঁক তারা ফেলে দুনিয়ায় যা মেলে না তারই উপর ; কিন্তু তার নেশা এমন যে সে-নেশায় বুঁদ হলে চোখ বুজেই জিন্দিগী ফুরিয়ে যায়। শাহ আলম ফকীর ছিল না সন্ত ছিল না, কঞ্জুস ছিল আর আওরতের ঝোঁকটা তার নিজের বেগমদের মধ্যেই বন্ধন করে রেখেছিল। বাদশাহ সুকরতাল আর পাত্থলগড় দখল করে যে দৌলত নিয়ে গেল সে দৌলত হিন্দুস্তানে পরে আর কেউ দেখেনি।

বাবুজী, কাবুলের দুরানী বাদশা শাহানশাহ আবদালী কোমরুদ্দিন ইন্তিজামউদ্দৌলার বাড়ির উঠানের নীচে কুঁইয়ার মত দৌলতখানা থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল এক এক আফগান জোয়ানের মত লম্বা সোনার বাতিদান—মন দু মন ওজন তার ; তাই নাকি দু তিন শও মিলেছিল। এমন দৌলত নাজিবউদ্দৌলাও লুঠেছিল। সারা পাঞ্জাব দিল্লী মথুরা রাজা সুরজমলের বল্লভগড় আর তামাম রোহিল লুটে সেই দৌলত পাত্থলগড়ে সে গেড়ে রেখেছিল। তার প্রায় বারো আনা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বাদশা লাল-কিল্লায় কোন এক গোপন জায়গায় পুঁতে রেখেছিল। তার হদিস কেউ জানতে পারেনি। বাদশাহী হারেমের নাজির খোজা মনজুর আলি সাহেবও না।

কালাশেরের নজর পড়েছিল সেই দৌলতের দিকে।

বাদশাহ পাত্থলগড় থেকে দিল্লী এল ; সঙ্গে নিয়ে এল জবিতা খানের ছেলে গোলাম কাদেরকে ; জিম্বা জামিন রইল। এরপর জবিতা খাঁ সাল সাল বাদশাহী মালগুজারী দাখিল না করলে নবাব-জাদা কাদেরকে কয়েদখানায় ঠেলে দেবে। ওর চেয়ে বেশী কিছু করলে নবাবজাদা কাদের সাহেবের গর্দান পর্যন্ত সাজা পৌঁছুবে।

কালাশেরের মা—যে সারা গায়ে গর্দা মেখে আর নিজের রক্ত মেখে মরেছিল—সে কালাশেরকে এই জন্যেই বলেছিল—বেটা, এই

নবাবজাদাকে তুমি বাঁচাতে চেষ্টা করো। বাঁচিয়ো। জবিতা খাঁ কখনও তার বাত্ রাখবে না। খেলাপ করবেই। এই লেড়কা আমাকে মিঠা বাত বলত। আমি তার বাপের জন্যে ঝাড়ুদারনী এক ডোমের বাঁদী। আমাকে সে মিঠা বাত বলেছে। কোই না বেটা কেউ বলেনি। ও বলেছে।

কালাশের মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু মনে মনে বলেছিল সে-কথা সে রাখবে।

—বাবুসাহেব! হুজরত রহিমশাহ সেদিন গুলবদ্‌নীর মাথার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—তুই বেঁচে গেছিস বেটী—তু বচ গয়ী, সেই সময়ে তুই যে নিজের আত্মার বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে ডেকেছিলি তা আমার কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন খুদা আর পয়গম্বর রসুল। আমাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—রহিমশা তোর মুরিদা রোতি হ্যায়—তুই যা। জলদি যা। তাই আমি এসেছি ছুটে। কবচটা ছিল বুকে তাই কলেজায় ছোরাটা বেঁধেনি। তুই বেঁচে গিয়েছিস।

ওই নবাবজাদাকে তুই ভুলে যা, 'পসর যা'। ও আর মানুষ নয়, ইনসান আর নয় গোলাম কাদের,—তার ইনসানিয়াত্ সে বেচে দিয়েছে কালাশেরের কাছে। কালাশের মানুষ নয়, কালাশের খুদ শয়তান।

বেটী, কালাশের নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে তার মায়ের কথাতে সাহায্য করত।

বাদশা তাকে জামিনদার হিসেবে দিল্লী নিয়ে এসেছিল। নবাব জবিতা খাঁ যা কিছু বে-আদবী যা কিছু হুজ্জৎ হামলা করবে তার জন্যে জামিন তার বেটা ওই গোলাম কাদের।

বাচ্চা ছেলে বাবুজী। তবে নবাবের ছেলে—আর রোহিলা নবাব

খান-ই-খানান নজিবউদ্দৌলায় নাতি—নবাব জবিতা খানের বেটা। সিপাহীর ঘোড়ার থেকেও জবরদস্ত আর দুঃসাহসী। সে অল্পে চমকাতো না। ভয় খেতো না। বাদশাহের ফৌজের সঙ্গে একটা বড় ঘোড়ায় চড়ে সে গিয়েছিল; তারই মধ্যে কালাশের সুবিধে করে নিয়ে ঠিক তার ঘোড়ার পাশেই নিজের ঘোড়াটা এনে সঙ্গে সঙ্গে যেতে শুরু করেছিল আর বলেছিল—কোন ভয় নাই তোমার নবাবজাদা। ঘাবড়াইয়ে মৎ। আমার নাম 'কালাশের'—আমি তোমার সহায় থাকব।

নবাবজাদা বলেছিল—কালাশের! তুমি এত বদ্‌সুরত আদমী কেন ?

হা-হা করে হেসে উঠেছিল কালাশের। বলেছিল—আমার আসল সুরত তুমি দেখতে পাচ্ছ না নবাবজাদা। আমার আসল সুরত এমনি সাদা চোখে কেউ দেখতে পায় না।

সবিস্ময়ে নবাবজাদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। কালাশের বলেছিল—এক জাদুর সুর্মা আছে নবাবজাদা যে সুর্মা চোখে পরলে তবে সে-সুরত তুমি দেখতে পাবে। এমনিতে পাবে না। সে সুর্মায় সারা দুনিয়ার রঙ বদল হয়ে যায় নবাবজাদা। ঔরতের বুকের ভিতর ফুল ফোটা দেখতে পায়. কালো রাতে লাখো লাখো আলো জ্বলে ওঠে।

নবাবজাদার দুই চোখ বড় বড় চোখ—সে চোখ আরও বড় হয়ে উঠেছিল। বুঝতে সে পারেনি। কিছুক্ষণ পর সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার কাছে সে সুর্মা আছে ?

—জরুর আছে। তুমি সে সুর্মা পরতে চাও ?

—চাই। দাও।

—সবুর কর না জমাবআলি, খোদাবন্দ্, আমার পেয়ারের মালিক। হবে। দেব। তোমাকে সে সুর্মা চোখে পরিয়ে দেব আমি।

সে-সুর্মপরা চোখে যখন তুমি যে কোন নওজোয়ানীর দিকে তাকাবে তখনই সে নওজোয়ানী তোমার জন্যে দেওয়ানা হয়ে যাবে। সে সুর্মা পরে দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাবে মানুষের মধ্যে থেকে জানোয়ার উঁকি মারছে। কেউ শের কেউ সাপ কেউ নেকড়ে কেউ বোকরা কেউ গিধ্বড় কেউ খচ্চর। লেকিন—

—কি? লেকিন কেয়া?

—নবাবজাদা মেরে পেয়ারে মালিক খুদাবন্দ্ হুজুরআলি, সে সুর্মা পরবার আগে যে বলতে হবে আর মানতে হবে কি, খুদা নেহি হ্যায়। পয়গম্বর রসুলকে মানি না। ইমান ঝুট হ্যায়।

নবাবজাদা কাদের জবিতা খাঁয়ের ছেলে নবাব নাজিবউদ্দৌলার নাতি হয়েও চমকে উঠেছিল। জবিতা খাঁ নাজিবউদ্দৌলা খুদাকে মানত, পয়গম্বর রসুলকে মানত কিন্তু ইমানকে মানত না। আর খুদাকে পয়গম্বরকে নামেই মানত কিন্তু কোন হুকুমত মানত না। নবাবজাদা কাদের এদের বংশধর হয়েও চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণ কালাশেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—তোমার মত কুৎসিত বদ্সুরত আদমী আমি কখনও দেখিনি।

কালাশের সে কথা যেন শুনতেই পায়নি; সে বলেই গিয়েছিল—নবাবজাদা, সে সুর্মা চোখে পরলে তুমি দুনিয়াকে শুধু আর এক রঙেই দেখবে না আরও 'বহুৎকুছ হোগা' হুজুরআলি। তুমি দেখবে তোমাকে দুসরা কোন শক্তিমান রক্ষা করছে। তোমাকে তার শক্তিতে শক্তিমান করে তুলেছে। নবাবজাদা, এই যে বাদশাহ শাহ আলম পাথলগড়ে তোমার মা বহেনকে পথে টেনে বার করে বেইজ্জতি করলে—এই যে পাথলগড়ের মেঝে খুঁড়ে দেওয়াল ভেঙে দৌলত লুঠ করে হাতী উট বয়েলগাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে, এ সমস্ত কিছুর শোধ হয়ে যাবে। খুনের বদলা খুন মিলেগা, নখের বদলা নখ,

চোখের বদলা চোখ, একের বদলে দুই। বে-ইজ্জতির বদলায় তুমি তাদের দুনো বে-ইজ্জতি করতে পারবে।

চিৎকার করে উঠেছিল গোলাম কাদের—সত্যি বলছ কালাশের ?

কালাশের বলেছিল—চুপ।

পাশের সিপাহীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে ?

কালাশের বলেছিল—নবাবজাদা বাচ্চা লেড়কা, হয়তো এমন অবস্থার ফেরে পড়ে মগজে কুছ গড়বড় হয়ে থাকবে।

চুপিচুপি নবাবজাদাকে বলেছিল—থোড়া হুঁশিয়ারিসে হুজুরআলি মেরে পেয়ারে নবাবজাদা! চুপসে মালিক।

নবাবজাদা বলেছিল—যা বলবে তাই মানব। দাও সুর্মা পরিয়ে। শোধ আমার চাই। বদলা আমার চাই।

—দিল্লীতে চলিয়ে হুজুরআলি। দিল্লীতে।

* * *

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, তাবারিখ হল দুসরা চিজ। তাবারিখকে তোমরা বল ইতিহাসে। তাবারিখে থাকে বাইরে যা ঘটে তাই। তাবারিখের যারা বুজুরুখ পণ্ডিত তারা এইসবগুলো মানে না। বাবুজী, ঔরংজীব বাদশার সময় শিববা মহারাজ গুরুর বলে যোগবলে উধাও হয়ে গেল আর তাবারিখবালারা লিখলে কি শিববা মহারাজা মিঠাইয়ের ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে চলে গেল। আরে বাপ—এতবড় একটা বীর সে মিঠাইয়ের ঝুড়ির মধ্যে লুকোবে কি করে ? যোগবলে গুরুর কৃপায় সে ছোট্ট হয়ে গেল। এবং ঢুকে গেল মিঠাইয়ের ঝুড়িতে।

তাবারিখে আছে দিল্লীতে নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে এক হাবেলী দেওয়া হল। তার তনখা আসত বাদশাহের খাজাঞ্চিখানা

থেকে। তার নোকর গোলাম বান্দা বান্দী বাবুর্চী তারও ব্যবস্থা করলেন বাদশা। গোলাম কাদের আটক রইল। কিন্তু কালাশেরের কোন কথা তাবারিখে নেই বাবুজী। ওইখানেই সব কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে ছুট হয়ে গিয়েছে। কেমন জান বাবুজী?

এই যে এই যে সেকেন্দ্রা—এই যে ইমারত, ধর, তোমার ফতেপুর সিক্রী আগ্রা—এর ইমারতগুলো তো কেবল পাথর আর পাথর আর কাঠ আর ইঁট দিয়ে তৈরী করা ইমারত। এর শুধু ইমারতই বাহারই আছে আর তো কিছু নাই। পিঁজরা বাবুজী। সোনেকা পিঁজরা —সোনার জিঞ্জিরও আছে কিন্তু চিড়িয়া নাই বাবুজী। চিড়িয়ার অভাবে সব ঝুটা হয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

বাবুজী গোলাম কাদেরকে একটা হাবেলী দেওয়া হয়েছিল বাদশাহী দপ্তর থেকে; মজা দেখ বাবুজী, হাবেলীটা মৃত বাদশাহ মহম্মদশাহের দুই বেগমসাহেবার হাবেলীর একদম গায়ে। মালকাই-জমানী আর সাহেবাইমহল। বাবুসাহেব, এই সাহেবাইমহলের বেটীই ছিল হজরতমহল যার সুরত ছিল বেহেস্তর হুরীর সুরতের মত। যার শরীরে রক্ত চলত দেখতে পাওয়া যেত। মহম্মদশাহের ছেলে ছিল আহম্মদশাহ; এ ছেলে হয়েছিল একটা হিন্দু নাচওয়ালীর পেটে। আহম্মদশাহ বাদশাহ হয়েছিল মহম্মদ-শাহের মৃত্যুর পর। এই আহম্মদশাহকে অন্ধ করে দিয়েছিল উজীব গাজিউদ্দিন। এবং তাকে হটিয়ে বাদশা হয়েছিল বুড়া দুসরা আলমগীর। এই শাহ আলমের বাবা।

এই হাবেলীতেই কালাশের একদিন নবাবজাদাকে খাওয়ালে কড়া এক পাত্র আরক আর চোখে পরিয়ে দিলে সেই সুর্মা। নবাব-জাদা গোলাম কাদের বললে—খুদা নাই, বিশ্বাস করি না; পয়গম্বর রসুলকে মানি না; ইমান বলে কিছুকে স্বীকার করি না। ন্যায়

বলেও কিছু নেই নীতি বলেও নেই; সব মানুষের তৈরী করা। ঝুট! একদম ঝুট! বিলকুল ঝুট! কানুনের কোন দাম নাই। আইনের কোন মানে নাই! পাপের কোন শরম নাই পুণ্যের কোন নিশান নাই! দুনিয়ায় যার জোর আছে তামাম মুল্কে তারই দখল তারই এখতিয়ার। হিন্দুস্তানের দৌলত এসে জমেছিল দিল্লীতে আমার বাপের বাপ জোরের দাবিতে লুটে নিয়ে গিয়েছিল পাথলগড়ে। বাদশা শা আলম মারাঠার সঙ্গে জুটে জবরদস্তি সে দৌলত আবার লুটে আনলে দিল্লী। গেড়ে রাখলে তোশাখানায়। আমি হলফ নিলাম এ দৌলত সুদসমেত হিসাব করে দামড়ী ঢেবুয়া পর্যন্ত শোধ করে তুলে ফের নিয়ে যাব পাথলগড় ঘাউসগড়।

কালাশের বলেছিল—সাবাস জী আমার মালিক! আজ থেকে আমি তোমার সিপাহসালার তুমি আমার বাদশাহ। তোমার জন্যে আমি জান দিয়ে লড়ব; লড়াই জরুর ফতে করব। পাথলগড়ের দৌলতই শুধু ফিরিয়ে পাবে না তার সঙ্গে ফিরে পাবে তোমার বংশের ইজ্জত। এই মুঘল বাদশাহী বংশের ইজ্জতকে তুমি তোমার পায়ের জুতোর তলায় মাড়িয়ে দেবে। পিয়ো আমার মালিক এই আরক পিয়ো। আর চোখে পর সুর্মা। দেখো, দুনিয়ার কেমন রঙ বদলাচ্ছে। বল নবাবজাদা—কালাশের আমার জিন্দগী তোমার। তুমি আমাকে লড়াইয়ে জেতাবে। তার বদলা নিজেকে তুমি আমার কাছে বেচলে বলো—

*　　*　　*

হজরত রহিমশাহ গুলবদনীকে বলেছিলেন—বেটী, এতকাল পর কালাশেরের খেল শুরু হয়েছে। জবিতা খাঁ বাদশাহী মনসবদার আবদুল কাসিম আলির ফৌজকে হারিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে—কাসিম আলি নিজে খতম হয়েছে। বাদশাহী ফৌজ কাসিম আলির লাশ নিয়ে দিল্লী ফিরেছে।

বাদশাহ শাহ আলম শোধ নিতে পাঠিয়েছে মিরজা নজফ খাঁকে। ওদিকে হুকুম দিয়েছিল নিয়ে এসো জবিতা খানের ছেলে গোলাম কাদেরকে। তার জান জামিন আছে।

কালাশের তাকে খিড়কি দিয়ে বের করে মালকাইজমানীর বাড়ির বান্দার পোশাক পরিয়ে দিল্লী শহরের পাঁচিলের ভাঙা জায়গা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। বলেছিল—কুছ ডর নেহি নবাবজাদা। ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছ—তুফানের মত ছুটিয়ে চলে যাও। মনে রেখো আমার মালিক, যাবার পথে যদি কারও কাছে সাহায্য নিতে হয়—সে যদি তোমার পরিচয় জানতে পারে তবে সাহায্য নিয়ে তাকে বেকসুর খুন করে চলে যাবে। মনে রেখো খুদার ডর নাই ইমানের দাম নাই—দুনিয়াতে তুমি সব। তোমার জানের জন্যে দুনিয়া কুরবানী করা যায়। পথে যেতে যাকে দেখবে সে তোমার গোলাম—ঔরৎ হলে সে তোমার বাঁদী। তোমার জেবে রাখবে এই আরক। এই আরক খেয়ে তর্‌র্‌ হয়ে থাকবে। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে। কিছু ডর করো না নবাবজাদা—কালাশের তোমার পিছনে রইল।

*   *   *

শক্কর—আমার বেটী! তোকে আর শিউজীর পুরোহিত মহারাজকে হাত জোড় করে কাম নিয়েছিল গোলাম কাদের। তারপর—

—তারপর বেটী কালাশের এল। তার আরকে সে তর্‌র্‌ হল। তোকে পেয়ে—। হায় রে বেটী! তুই তাকে দেখে ভুলেছিলি। এখনও তোর সে নেশার ঘোর লেগে আছে। তোর চোখের চাউনিতে আমি বুঝতে পারছি। তোর কান্নার ফোঁপানিতে আমি বুঝতে পারছি। তোকে ছুঁয়ে আমি বুঝতে পারছি এখনও তোর সারা শরীরে নবাবজাদার জন্যে তিয়াস ফটে রয়েছে। মেঘের

পানির জন্যে জমিনের তিয়াসের মত সে তিয়াস নওজোয়ানীকে দেওয়ানা করে দেয়। কিন্তু না বেটী। তা হয় না। বেটী, আমি রহিমশাহ—আমি গুরুর কৃপায় ভূতপ্রেত জিনের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারি কিন্তু কালাশেরের কাছে নিজেকে যে বেচেছে—যে তার তৈরী আরক খেয়েছে—তার সুর্মা চোখে পরেছে তাকে বাঁচাতে পারব না। আর যে ঔরৎ তার নেশায় পড়বে তাকে বাঁচাতে পারি না। তুই তাকে ভুলে যা বেটী। তাকে ভুলে যা।

কিন্তু গন্ধর্বী নটীর ঘরের মেয়ে গুলবদনীর কান্না থামেনি। কান্না তার বেড়েছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হজরত রহিমশাহ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন নীরবে।

(দশ)

সারা রোহিলখণ্ড জুড়ে যুদ্ধ লেগে গেল। বাদশাহী ফৌজ এসে ছড়িয়ে পড়ল রোহিলখণ্ডে। জবিতা খাঁ শিখ সর্দারদের সঙ্গে হাত মেলালে। রোহিলখণ্ডের অন্য রোহিলারা সরে থাকতে চেয়েছিল। জবিতা খাঁকে তারা বারণও করেছিল। শোনেনি জবিতা খাঁ।

দিল্লীতে বাদশাহী শক্তি তখন আবার একবার জমে উঠে শক্ত হতে শুরু করেছে। কালটাও সেদিক থেকে খানিকটা অনুকূল। স্রোতের টানের উপর বাতাসের দাক্ষিণ্যের মত।

১৭৭৬। ৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস মনে পড়ল আমার।

শক্তিসামর্থ্যের ভাঙা হাটে দাঁড়িয়ে বাদশাহ শাহ আলম আর একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন।

পাঁচবক্ত নামাজ পড়ে খুদার দরবারে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে

বলতেন—আর একবার দয়া কর মেহেরবান দিন দুনিয়ার মালিক! পয়গম্বর রসুল তোমার খাদিমকে তুমি রক্ষা কর সাহায্য কর। সারা হিন্দুস্তানে তোমার হুকুমৎ আমি জারি করব।

আবার ভাবতেন—মনে মনে সংকল্প করতেন—না—ধর্ম নিয়ে ঝগড়াকে হিন্দুস্তানে আর প্রশ্রয় তিনি দেবেন না। জলো জমিতে যেমন জলো ঘাসের আগাছার শিকড় এতটুকু পড়লে সারা জমি ছেয়ে ফেলে তেমনিভাবেই হিন্দুস্তানে ধর্মের ঝগড়ার এতটুকু দেখতে দেখতে বিপুলবিস্তার হয়ে ওঠে। ওকে আর প্রশ্রয় দেবেন না।

আবার ভাবতেন—জিন্দাপীর বাদশাহ আলমগীর মহীউদ্দিন ঔরংজীব যেমন মদ আর গানবাজনা তার সঙ্গে ঔরৎ নিয়ে বিভ্রমকে সারা মুল্ক থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন তিনিও তাই করবেন। জাহান্নমে গেল গোটা মুল্ক। মদে ভেসে গেল—ঔরতের ভুখায় গোগ্রাসে ব্যভিচার করে ক্ষয়রোগের মত রোগে ভুগে চললো কবরখানায়।

আফিং খেতেন আর নানান কল্পনা করতেন। যেদিন নেশা খুব চড়া হত সেদিন কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে উঠত।

আবদুল কাসিমের মৃতদেহ এসে পৌঁছুল—বাদশাহ দাঁড়িয়ে দেখে বললেন—কবর দাও। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কবর দিয়ো। আর বললেন—উজীর আহাদ এবং মিরজা নজফ তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কর।

গোটা দিল্লীর বাজারে সেদিন হইহল্লা উঠেছিল। নাজিব-উদ্দৌলার ছেলে জবিতা খাঁ রোহিলা উজীর আবদুল আহাদ খাঁর সহোদর ভাই মনসবদার আবদুল কাসিম খাঁকে লড়াইয়ে হারিয়ে তাকে জানে খতম করে দিয়েছে। বাদশাহী ফৌজ হেরে গেছে রোহিলখণ্ডে।

এবার হয়তো জবিতা খাঁ রোহিলা পাঠান সিপাহী নিয়ে দিল্লী আসবে। পাত্থলগড়ের শোধ নেবে।

বেলা তুপহরের পর খবর রটল জবিতা খাঁয়ের বেটা জামিনদার গোলাম কাদের—যার বয়স পনের কি ষোল—সে বাদশাহী পিঁজরা থেকে উড়েছে। পালিয়েছে সে। ফৌজও ছুটেছিল তার পিছনে।

বাদশাহ আহাদ খাঁ উজীরকে বললেন—উজীর, তোমাদের ঝগড়া মুলতুবি রাখো। তোমার সঙ্গে মিরজা নজফের ঝগড়ার কথা জানি আমি। সে বুঝাপড়া তোমরা পরে করো। এখন জবিতা খানের দিল্লগীর জবাব দাও। তোমার মায়ের পেটের ভাই—তার মৃত্যুর শোধ নাও।

মাহাদজী সিন্ধেকে ডেকে বললেন—মাহাদজী সিন্ধে, তোমার কি মনে নেই পানিপথের লড়াইয়ে মারাঠারা হেরেছিল—ভাওসাহেবকে কেটেছিল আর তার তাঁবু থেকে শও দরুনে মারাঠা আওরৎ লুঠেছিল যারা তাদের মধ্যে প্রধান জন ছিল রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা? সে কথা ভুলে গেছ? তোমরা তার শোধ নাও।

মিরজা নজফকে ডেকে তাকে খেলাত দিয়ে বললেন—তুমি আজ থেকে হলে দিল্লীর বাদশাহের মীরবক্সী। বেইমান জবিতা খাঁকে বেঁধে হোক মেরে হোক আমার কাছে হাজির করো।

বাদশাহী ফৌজ দিল্লী থেকে রওনা হল রোহিলখণ্ডের দিকে। লড়াই ছড়িয়ে পড়ল সারা রোহিলখণ্ডে।

*   *   *

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, পুরা এক বছর লড়াই চলল। জবিতা খাঁ শেষ পর্যন্ত হারলে। আবার ঘাউসগড় পাত্থলগড় পড়ল—দখল করলে বাদশাহী ফৌজ। গোটা রোহিলখণ্ডের রোহিলা

পাঠানেরা সমতল অঞ্চল ছেড়ে পাহাড়ের কোলে বন অঞ্চলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল। জবিতা খাঁ পালিয়ে গেল শিখদের সঙ্গে।

—তুমি তো জান বাবুজী সে আমলের কথা। সে আমলে টাকায় সব হত।

হেসে বললেন ফকীর—কোন্ আমলেই বা হয় না বাবুসাহেব! টাকা সব আমলেই হয়কে নয় করে নয়কে হয় করে, দোস্তকে দুশমন করে, আবার দুশমন দোস্ত হয়; টাকার জন্যে মানুষ ছেলে বিক্রি করে, ঔরৎ বিক্রি করে, বেটী বিক্রি করে; বাবুজী, নিজেকে বিক্রি করে; দেশের আজাদী তাও বিক্রি করে। সে আমলে টাকার দাম সব থেকে বেশী চড়েছিল বললেই ঠিক বলা হবে; পাঁচ সাতটা ছেলে থাকলে দশ বিশ টাকায় একটা বেটা দিব্যি হাসিমুখে বেচে দিত। শিখরা টাকা নিয়ে জবিতা খানের হয়ে লড়তে এসেছিল। কিন্তু বাদশাহী ফৌজের কাছে হারলে; রোহিলারা পালাল তরাইয়ের জঙ্গলে; শিখেরা পালাল নিজেদের মুল্কে উত্তর পাঞ্জাবে। সাহারানপুর জালালাবাদ ঘাউসগড় পাথলগড় ছেড়ে দিয়ে জবিতা খাঁ কর্নাল জেলায় সর্দার গজপৎ সিংহের কাছে গিয়ে জান বাঁচালে। সঙ্গে নিজের ফৌজ না সিপাহী না শুধু দশ পনের জন পাঠান নিয়ে গিয়ে উঠল।

বাবুজী, জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে চুসরা পায়জামা ছিল না কুর্তা ছিল না শিরপেঁচ ছিল না। হীরা না মতি না সোনা না দানা না—একদম ফকীরের মত গিয়ে পোঁছুল মাথা হেঁট করে।

শিখ সর্দারেরা তাকে আশ্রয় দিলে। বললে—হাঁ ওর বাপের কাছ থেকে আমরা টাকা অনেক পেয়েছি একসময়।

জবিতা খানের মুন্সী মনসুখ রায় তার সঙ্গে ছিল—সে কথাটা মনে পড়িয়ে দিল সর্দার গজপৎ সিংকে। আরও বললে—বাদশাহী

ফৌজকে হটিয়ে রোহিলখণ্ড ফিরিয়ে দাও সর্দারজী—নবাব জবিতা খান জরুর তোমাদের দেনা শোধ করবে।

জবিতা খাঁ মাথা হেঁট করে বসে ছিল। সে ভাবছিল তার জ্ঞাতিদের কথা। সারা রোহিলখণ্ডের রোহিলা পাঠান নবাবদের কেউ তাক সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। হাফিজ রহমৎ পর্যন্ত না! তার নাজিবাবাদ ঘাউসগড়ের উমরখেল পাঠানেরা পর্যন্ত এ বিপদে ঘাউসগড় ছেড়ে ঘরসংসার নিয়ে যে যার পালিয়েছে। ঘাউসগড় থেকে সে বারবার অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে কিন্তু তার বেগম আর ছেলে দেয়নি। বড়ীবেগম আর বড়ছেলে গোলাম কাদেরের বুকের মধ্যে রাগ আর ক্ষোভ জোড়া সাপের মত ফুঁসছে। তা ছাড়া—।

তা ছাড়া এই সহায়সম্বলহীন অবস্থায় যদি এই শিখেরা কাল মিরজা নজফ আলির ফৌজের ভয়ে কি টাকার লোভে তাকে বাদশাহী ফৌজের হাত দিয়ে দেয়?—তা হলে? এয় খোদা—!

সে সর্দার গজপৎ সিংকে বললে—সর্দার গজপৎ পাঁইজী, তোমাদের শিখধর্ম উদার। তোমাদের গুরুই বোধহয় দুনিয়ার শেষ পয়গম্বর। খুদার হুকুমৎ—

—খুদার নয় খানসাহেব—"অলখ? নরঞ্জনের"।

—হাঁ। অলখ নরঞ্জন আর খুদা এ দুয়ে ফরক নেই।

—না। অলখ নরঞ্জনই সব।

—তাই মানব সর্দারজী। ভাইসাব, আমি শিখ হয়ে যাব। আমি তোমাদের একজন হয়ে থাকব তোমাদের মধ্যে। তোমরা আমাকে যেন পরিত্যাগ করো না।

* * *

বাবুজী, আরও কিছুদিন পর। পুরাপুরি গুলবদনী জিন্দগীর

সেই যে একটা কালারাত এসেছিল—এক জ্যোৎস্না আর কুয়াসাভরা রাত—সেই দিন থেকে প্রায় এক বছর পর।

তখন সারা মুল্কটা হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত আর ভয়ে ত্রস্ত। রোহিলখণ্ডের জবিতা খাঁ নবাবের ওদিক থেকে লোকজন পালিয়ে আসছে। কোথায় কার আপন জন আছে মেহমান আছে তাদের কাছে এসে মাথা গুঁজে থাকছে। বিশেষ করে জবিতা খাঁয়ের ফৌজ কি দপ্তরের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ছিল তারা পালিয়ে আসছে। বাদশাহী ফৌজ ঢুকলে তাদের খুঁজবে আগে।

ঘাউসগড় পড়তে আর দেরি নাই।

এবার ঘাউসগড় পড়লে বাদশাহের হুকুম—জবিতা খাঁ আর তার বেটা গোলাম কাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে এনে হাজির করো। কিংবা তাদের শির কেটে বর্শার উপর বসিয়ে নিয়ে এসো। ঘাউসগড় থেকে দিল্লী পর্যন্ত পথের হু'ধারের হিন্দুস্তানীরা দেখুক মুঘল-এ-আজম শাহ আলম এখনও হিন্দুস্তানের জান জমিনের মালিক, বাদশাহ গাজী পীর। মীরবক্সী হয়েছে মিরজা নজফ। তার হাতে হুকুমনামা সহি করে দিয়েছে বাদশাহ। মিরজা নজফ ইরানী খানদান ঘরের ছেলে। জবরদস্ত জঙ্গী জোয়ান সে। তাদের সঙ্গে আছে মাহাদজী সিন্ধের বর্গী ফৌজ।

* * *

সেদিনও সন্ধ্যেবেলার দিক। সেই অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের চত্বর। একটা ভিড় জমে উঠেছিল; হুটো ডুলি এসে নেমেছে সেখানে। বাতে পঙ্গু এক প্রৌঢ়া এসেছে—তার সঙ্গে এসেছে এক মধ্যবয়সী বিধবা আর তাদের সঙ্গে এসেছে এক নওজওয়ান আর এক বুড়া রাজপুত।

তারা স্বপ্ন দেখেছে বাম্‌নওলী গাঁয়ের অমৃতেশ্বর শিউজী

মহারাজ দয়া না করলে এই ব্যাধি সারবে না। স্বপ্ন হয়েছে এইখানে থেকে প্রতিদিন ওই চত্বর মার্জনা করতে হবে তবে সারবে।

বুড়া পুরোহিত মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। আরও লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গুলবদ্‌নী। পশ্চিমমুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম আকাশ তখন সন্ধ্যার মুখে রাঙা হয়ে উঠেছে। শীতের আমেজ তখনও রয়েছে। রাঙা আলোয় গুলবদ্‌নী যেন ঝলমল করছে নতুন ফুলধরা লতার মত।

হজরত রহিমশাহ বলতেন—লেড়কীটা এক বছরের মধ্যে যেন হু-হু করে বেড়ে গেল। মেয়েদের এমনি একটা বয়স আছে যখন তারা বর্ষার নদীর মত, বসন্তকালের ফুলধরা লতার মত ভরে ওঠে, ফুলন্ত হয়ে ওঠে। ছ মাস এক বছর না-দেখার পর দেখলে ঠিক যেন চেনা যায় না। চেনা গেলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে এ-মেয়ে সেই মেয়ে। হালকা রোগা হিল-হিলে মেয়ে নওজওয়ানীর বাহার জলুস সর্বাঙ্গে মেখে দাঁড়িয়ে ছিল। পশ্চিমের লাল রঙের ছটায় সত্যিই ঝলমল করছিল।

বুড়া রাজপুত সর্দার কথা বলছিল পুরোহিত মহারাজের সঙ্গে। আর মাঝবয়সী রাজপুত বিধবাটি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েদের কাছে। হঠাৎ এগিয়ে এসেছিল শঙ্করের সামনে। জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কে বেটী ?

লজ্জায় রাঙা হয়ে সে বলেছিল—আমি—আমার নাম গুলবদ্‌নী।

—হাঁ। গুলাবের মতন বদন তোমার বটে! কিন্তু—কার মেয়ে তুমি ?

গুলবদ্‌নীর মা এগিয়ে এসেছিল বিধবার সামনে—আমার মেয়ে।

—তোমার মেয়ে?

গুলবদ্‌নীর মা এর উত্তর দিতে পারেনি। সে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। অনেকক্ষণ পর বলেছিল—তুমি—তুমি?

ছত্রী বিধবাটি বলেছিল—হ্যাঁ আমি—কিন্তু চুপ কর। আমরা তোমার খোঁজেই এসেছি।

খুব চুপিচুপি বলেছিল রাজপুত বিধবা। অন্য কেউ শুনতে পায়নি।

* * *

বাবুজী! ওই রাজপুত সর্দার হল নবাব নাজিবউদ্দৌলার একজন পেয়ারের সর্দার। ঘাউসগড় থেকে কিছু দূরে এক গাঁওয়ের মধ্যে ছিল তার মাটির কিল্লা আর চার পাঁচখানা গাঁ নিয়ে ছিল তার জায়গীর। খাস ঘাউসগড়ের এলাকার দক্ষিণ দিক ঘিরে চারখানা গ্রামের সর্দার ছিল—ঘাটোয়ালের মত ঘাঁটি আগলদার। দুশমন এলে প্রথমেই লড়াই হত তার সঙ্গে। পুব পশ্চিম আর উত্তরে ছিল আরও তিনজন সর্দার। তারা সকলেই ছিল উমরখেল পাঠান সর্দার। আজ বাদশাহী ফৌজের তোপ আর বন্দুকের মুখে ঘাউসগড়ের চারিপাশের গ্রামের সব ঘাঁটি পড়ে গিয়েছে। পাঠান সর্দারেরা জেনানী লেড়কা লোকলস্কর নিয়ে পাহাড় জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। বুড়ো রাজপুত সর্দার শেষ ঘাটোয়াল। সে তার পঙ্গু স্ত্রী বিধবা পুত্রবধূ আর পৌত্রকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল বামন্‌ওলীর পাশ দিয়ে যে সড়ক গিয়েছে সেই সড়ক ধরে। তারা দিল্লীর দিকেই চলেছিল। জবিতা খাঁ পশ্চিম দিকে কর্নালে পালিয়েছে; সেখানে সে ইসলাম পরিত্যাগ করে শিখ হয়েছে—নাম নিয়েছে ধরম সিং; এ সংবাদের পর গোটা ঘাউসগড় ভেঙে গেছে। জবিতা খাঁয়ের বড়ীবেগম আর বড়বেটা গোলাম কাদের

পাগলের মত হয়ে গেছে। বুড়া সর্দার চান্দ সিং তার নাতি মনিয়ার সিংকে নিয়ে তাদের সঙ্গে থাকবে সংকল্প করে বুড়ী সর্দারনী আর বিধবা পুত্রবধূকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবার জন্যে বেরিয়েছে শেষরাত্রে।

জবিতা খাঁয়ের শিখ হওয়ার খবরটা এসেছে কাল সন্ধ্যেতে। ঘাউসগড়ের ভিতরে যারা আছে তারা বিদ্রোহ করেছে জবিতা খাঁয়ের স্ত্রী পুত্রের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে রোহিলা পাঠানেরা দলে দলে উত্তরমুখে তরাই জঙ্গলের মুখে ছুটেছে। বাদশাহের ফৌজের হাতে পড়লে জান যাবে ইজ্জৎ যাবে দৌলত যাবে। জবিতা খাঁকে আঁকড়ে থাকলে ধর্ম যাবে ইনসানিয়াত যাবে। তার থেকে অরণ্য ভাল। জঙ্গল ভাল।

জঙ্গলে হয়তো সর্দার চান্দ সিংও যেতে চাইত। কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রী আর বিধবা পুত্রবধূকে জঙ্গলে ফেলে ফিরে আসার কল্পনা করতে পারেনি। লোকালয় মানুষ আত্মীয়স্বজন স্বধর্মীর কথাই মনে হয়েছে।

নবাব নাজিবউদ্দৌলার পাশে পাশে থেকেছে সর্দার চান্দ সিং।

নবাব নাজিবউদ্দৌলার সঙ্গে তার কয়েকটা শর্ত ছিল। এ শর্ত কখনও মুখোমুখি কথা বলে হয়নি। আপনাআপনি হয়ে গেছে।

নবাব নাজিবউদ্দৌলা যখন মথুরা লুঠ করবার জন্যে আমেদশা আবদালীর ফৌজের সঙ্গে জাঠদের বল্লভগড়ের যুদ্ধের পর রওনা হয়েছিল তখন চান্দ সিং নবাবের হুকুম না নিয়েই ফিরেছিল তার রাজপুত সিপাহী নিয়ে।

নবাবসাহেব ইঙ্গিতে পরে জানিয়েছিল তাতে নবাব অখুশী হয়নি। তখনকার দিনে এর বেশী আপোষ দরকার হত না বাবুজী। স্রিফ দেওতার মন্দির ভাঙ্গা, দেওতা ভাঙ্গা, বাস্। না হলে বাবুজী হিন্দুর বাড়ি হিন্দুর ঔরৎ হিন্দুর দৌলত এ লুঠতে হিন্দুর এতটুকু

আপত্তি ছিল না—তারা অনেক লুঠেছে। বর্গী সিপাহীরা হিন্দু মুসলমান বেছে লুঠ করেনি। তছাড়া মুসলমান ঔরতের চেয়ে হিন্দু ঔরৎ লুঠের উপর ঝোঁক ছিল বেশী। শুধু মন্দিল আর দেওতা। এ যখন লুঠ হত ভাঙা হত তখন চান্দ সিং সরে আসত। আগেই সরে আসত। নবাব তাতে আপত্তি করত না। ষোল সতের বছর বয়স থেকে নবাব নাজিবউদ্দৌলার নোকরি নিয়েছিল। জাঠ রাজপুতের ছেলে লাঙ্গল আর লাঠি ছেড়ে হাতিয়ারবন্ধ্ হয়ে সিপাহী হয়েছিল। সিপাহী থেকে মনসব পেয়েছে, জায়গীর পেয়েছে। ছোট মনসব ছোট জায়গীর। তা হোক। বুড়া চান্দ সিং কখনও বেইমানি করেনি। আজও সে তা করতে পারবে না। তার একমাত্র ছেলে গণপৎ সিং একবার এক পথের নাচনেবালী নওজওয়ানীকে নিয়ে পাগলা হয়েছিল; খুদ নবাবসাহেবের এক ভাতিজার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল সেই ঔরৎকে নিয়ে। নবাবসাহেব বিচার করে বলেছিলেন—এ ঔরৎ পাবে গণপৎ। এ ছোকরী ভালবাসে গণপৎকে। গণপৎও ভালবাসে এ ছোকরীকে। আমার ভাতিজা হলে কি হবে সচ বাত বলতে হবে—তার স্রিফ ঔরতের ভুখা। ভুখার খানা বহুৎ মিলবে।

ষোল বছর আগের কথা। পানিপথের লড়াইয়ে গণপৎ মরেছে। তখন সে লেড়কী চান্দ সর্দারের বাড়িতে ছিল। গণপতের মৃত্যুর পর চান্দ সর্দার তাকে বিদায় করে দিয়েছিল। কিছু টাকাকড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাড়ি। তখন তার কোলে ছিল ছোট এক লেড়কী। ওদিকে তখন নবাবসাহেবের ভাতিজা তাকে নতুন করে পাবার জন্যে ক্ষেপেছে। কিন্তু লেড়কী পথের নাচওয়ালী জাতগন্ধর্বী নটীর বেটী হলে কি হয়, সে গণপতের মৃত্যুর পর বেওয়ার মতই থাকতে চেয়েছিল। গণপৎ ছিল মর্দানার মধ্যে শের মর্দানা। তাকে যে একবার ভালবেসে পেয়েছে সে তাকে ভুলতে

পারে না। নটী মেয়েটাও পারেনি! চান্দ সর্দার একদিন রাত্রে তাকে ডুলিতে চড়িয়ে নিজে পাহারা দিয়ে এনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এই বাম্‌নওলীর এই অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দির-চত্বরে। সে মেয়েও ছিল নটীর মেয়ে। কিন্তু এ গ্রামের নটীর মেয়ে নয়। বামন্‌ওলীর নটীপাড়ার খ্যাতি ছিল অমৃত্‌কুমারী বাঈয়ের জন্যে। অমৃতেশ্বর শিউজীর জন্যে। আর এ গ্রামের বাসিন্দাদের জন্যে। একটা খ্যাতি ছিল যে বাম্‌নওলীতে আশ্রয় নিলে তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। হজরত রহিমশাহের শাসন এখানে। অন্যদিকে এ গ্রাম ছিল খুদ বাদশাহের এলাকা।

এত কাল পর—ষোল বৎসর পর; আত্মীয় বন্ধুর সন্ধানে চান্দ সিং নাতি মনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে দুই ডুলিতে বুড়ী স্ত্রী আর বিধবা পুত্রবধূকে চাপিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হবার কথা ভেবেছিল; দু চারজন আত্মীয়ের কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ছিল অনেক বিপদ।

বাবুজী, তখনকার কালের কথা তো পড়েছ। বড়লোক আমীর সর্দার রাজা নবাবের বাড়ি ঔরৎ পাঠালে সে ঔরৎ বুড়ী হলে ফিরত, কুৎসিত হলে ফিরত। কিন্তু খুবসুরত আর নও-জওয়ানী হলে বড় একটা ফিরত না। বাবুজী, জাঠরাজা সুরজমলের বাড়িতে এক সুন্দরী সধবা মেয়ে—একটি ছেলের মা সে, ছেলে কোলে করে এসেছিল রাজার অন্দরে মেহমান হিসেবে। বাস্‌ রাজার চোখে পড়ে সে ওই অন্দরে থেকেই গেল। সে একলা থাকল না, ছেলেও থাকল; আর পরে সে রাজা সুরজমলের ছেলে হয়েই রাজার সিংহাসনে বসল রাজা হল।

চান্দ সিংয়ের অন্দরেও এমন মেয়ে না-থাকা নয়। আছে। তাদের দাম কিছু নেই তার কাছে। যে-ঔরৎকে নিজের স্বামী

নিজের জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হল সে ছিনিয়েলেনেবালার বাড়িতে বেঁচে থাকে, হাসে ; সে মেয়ের দাম কি ? তার কাছ থেকে অন্যের কাছে গেলেও সে ঠিক এমনি করেই হাসবে গাইবে নাচবে খাবে বেঁচে থাকবে। তাই তাদের কথা ভেবে মাথা খারাপ করেনি চান্দ সিং। আর তারা তো কম নয়। তারা অনেক। ভাবনা তার বিধবা পুত্রবধূ মনিয়ারের মা আর বুড়ী স্ত্রী গণপতের মাকে নিয়ে।

পথে বের হবার মুখে মনে পড়েছে বাম্‌নওলীর কথা। বাম্‌নওলী! বাম্‌নওলীর নটীপাড়ায় এক নটী পুত্রবধূকে চান্দ সর্দার রেখে এসেছিল। হাঁ সে নটীও বটে সে তার বেটার বউও বটে।

নবাবের ভাতিজা তখন জায়গীর পেয়েছে দৌলত পেয়েছে, তার মর্দানা সুরতও ছিল ভাল, তবু নটীর বেটী গণপৎকে ভোলেনি।

এক নটীর মেয়ে ছিল রানাদিল; শাহজাদা দারা শিকোর বেগম। সে হিন্দু সতীর মত বিধবা হয়েই ছিল জিন্দগীর শেষ পর্যন্ত; বাদশাহের বেগম হতেও সে চায়নি। এ নটীর মেয়ে চন্দ্রমুখীর সে কান্না দেখে চান্দ সিং সেকালে একদিন রাত্রে এই বাম্‌নওলীতে এসে তাকে রেখে গিয়েছিল। দিয়ে গিয়েছিল হজরত রহিমশাহের কাছে। পরিচয় দেয়নি। বলে গিয়েছিল—হজরত, আপনি নটীদের গন্ধর্বীদের গুরু। আপনি হজরত। এ বেটী নটীর বেটী। কিন্তু আমার বিধবা পুত্রবধূ। নবাবজাদার হাত থেকে একে বাঁচানোর সাধ্য আমার নাই। এ ছত্রীর মেয়ে হলে আমি লড়তাম। এ নটীর মেয়ে। বিয়েও লোক-দেখানো হয় নাই। তবু চন্দ্রমুখী বিধবা সেজেই থাকতে চায়। তাই এখানে দিয়ে গেলাম। আমার পরিচয় আপনি নিশ্চয়

বুঝবেন। আপনি সব জানেন। কিন্তু আপন মুখে আমি বলব না। এ যদি কোনদিন নিজে থেকে বিয়ে করতে চায় কাউকে—কারুর কাছে নিজেকে বেচতে চায় সে করবে। তার বিচার করবেন খুদা ভগবান। কিন্তু কেউ যেন জবরদস্তিতে ওর বিধবাধরমকে বরবাদ করে দিতে না পারে।

০ ০ ০

এতকাল পর আশ্রয়ের সন্ধানে পথে বেরিয়ে হঠাৎ চান্দ সিংয়ের মনে পড়ল চন্দ্রমুখীর কথা, বাম্‌নওলীর কথা।

স্ত্রীকে এবং পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করল—দেখব একবার বাম্‌নওলী গিয়ে?

—কি দেখবে?

—দেখব চন্দ্রমুখী আজও সেই চন্দ্রমুখী আছে কি না? তার বেটী—

—ছি!

—ছি-র কথা নয় গণপতের মা। যদি লজ্জাশরমের কিছু দেখি তো চলে যাব! আর যদি দেখি—।

—যদি দেখ—। কি দেখ?

—যদি দেখি আজও তাকে বলতে পারি গণপতের প্যারী, মহব্বতের ভালবাসার ঔরৎ তাহলে ওখানেই বাড়ি ভাড়া করে রেখে আমরা ফিরব ধাউসগড়। শ্রিফ এমন একজনকে পাবে যাকে আপন জন বলতে পারবে। দরিয়ার তুফানে যখন ভেসে যায় মানুষ তখন খড়ের কুটোগাছটাকেও আঁকড়ে ধরে সর্দারনী। তার বেশী কিছু না।

—কিন্তু—কি পরিচয় দেবে?

—পরিচয় দেব—স্বপন পেয়ে এসেছি। তোমার বাত বেমার ভাল হবে অমৃতেশ্বরের মন্দির ঝাড়ু দিলে।

স্বপ্নের কথার অজুহাতটা এমনই সত্য—সত্যের চেয়েও অধিকতর সত্য যে কেউ কোন কথা খুঁজে পায়নি।

মনিয়ার সিং নওজওয়ান বাবুজী। সে সমস্তক্ষণ চুপচাপ বসে দাদোর কথা শুনছিল আর লড়াইয়ের কথা ভাবছিল। সে হঠাৎ বলে উঠেছিল—আর বেশী তকরার করো না দিদিয়া। চল—বেরিয়ে পড়। না হয় তো চুপ হয়ে যাও। ঘুমিয়ে যাও। যখন সব পড়বে—আমরা পড়ব ঘোড়া থেকে মাটিতে—কেল্লার দরওয়াজা পড়বে মুখ থুবড়ে তখন জওহর করে কুঁইয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ো।

বুড়ী নাতির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিল—সেই ভাল। কোথায় যাব—সেই বামনওলী সেই কোন্ নটীর বাড়িতে? যদি দেখি—।

মনিয়ার বলেছিল—না দিদিয়া তা হবে না। আমার মনে পড়ছে সেই ছোট মাঈজীকে। হাঁ বাপজী আমাকে বলত—বেটা ও তোমার ছোটি মাঈজী—ওই ছোটিসি বাচ্চি ও তোমার বহেন। ছোটি মাঈজী ভাল ছিল দিদিয়া। তুমি চল।

বাবুজী!

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—এই বাচ্চনদের একটা বোধ আছে। তারা ভাল মন্দ বুঝতে পারে। বাবুজী, আগুন গরম আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, সাপে কাটলে মানুষ মরে এ তারা জানে না এ বাত ঠিক কিন্তু একটা খারাপ মানুষের কাছে দাও ছেলেকে—সে যাবে না তার কাছে থাকবে না কিছুতে—কাঁদতে শুরু করবে।

মনিয়ার সেই বোধ থেকে বলেছিল।

ফকীরসাহেবের সঙ্গে আমার মতে মেলেনি। মনিয়ারের তরুণ মনে একটা আবেগ জেগে উঠেছিল। সেই শৈশবে যে একটি

স্নেহময়ী নারীকে সে 'ছোটি মাঈজী' বলত যে তাকে সস্নেহে কোলে টেনে নিত, তার কথা সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে একটি আবেগের সৃষ্টি করেছিল!

সে আবেগ তার মিথ্যা হয়নি।

গুলবদ্‌নীর মুখে দেখতে পেয়েছিল তার বাপের মুখের আদল।

চন্দ্রমুখীকে দেখতে পেয়েছিল বিধবার বেশে।

মনিয়ারের মা বলেছিল—চুপ কর। আমরা তোমার খোঁজেই এসেছি।

(এগার)

"দুনিয়াতে যে সব ঘটনা ঘটে সে সবই একটার সঙ্গে আর একটার বাঁধনে বাঁধলে লক্ষ বাঁধনে কোটি বাঁধনে বাঁধা। একটা ঘটে তাই আর একটা ঘটে, ছকে ছকে পাশার গুটির মত। আর দান ফেলেন যিনি সব ঘটান তিনি। কখনও কখনও পাশা তাঁর হাত থেকে চলে যায়– পাশার হাড় তিনখানা গিয়ে পড়ে শয়তানের হাতে। মানুষেরা তাদের কর্মফেরে তুলে দেয় ভাগ্যের পাশা তিনখানা সেই শয়তানের হাতে।"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন ফকীরসাহেব। সেকেন্দ্রার সামনে বাদশাহী সড়কের উপরে এতক্ষণে দু চার জন লোক দেখা যাচ্ছে। দু চারখানা লরী যাওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সে সব যেন চোখে পড়েও চোখে ঠিক পড়ছিল না। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল মনের কাছে। আধুনিক কালের যা কিছু চিহ্ন পরিচয় সবই বিচিত্রভাবে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। বাদশাহী

সড়কটা এখনকার কালে পিচ দেওয়া—তার উপর ট্রাক মোটরগাড়ি ছুটছে এবং এক ধার ঘেঁষে একসারি উট চলছে—কয়েকটা গরুর গাড়ি দুটো ঘোড়া চলে গেল—এর মধ্যে বিচিত্রভাবে রাস্তার ধুলো যা উড়ল তাই যেন চোখে পড়ল, রাস্তার উপর পিচের কালো দাগ ঠিক চোখে পড়ল না—তেমনিভাবেই উটের সারি বয়েল গাড়ি ঘোড়া ঘোড়সওয়ারই চোখে পড়ল—মোটর কার এবং মোটর ট্রাক বিচিত্রভাবে আড়াল পড়ে গেল। দেখলাম তবু তার ছায়া ফেলে গেল না।

ফকীরসাহেব সেই নির্জন উত্তপ্ত অপরাহ্ণে তাঁর কাহিনী বলার ভঙ্গির মধ্য দিয়ে আমাদের মনের চোখের সামনে এ-কালের বাস্তবের প্রকৃতির বুকে সে-কালকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। সামনে প্রান্তরের মধ্যে দূরে দিকচক্রবালে ধূলিধূসরতার মধ্যে মনে হচ্ছিল হয়তো জাঠ ফৌজ কি বর্গী ফৌজ কি বাদশাহী ফৌজ বা দুর্ধর্ষ গুজর ডাকাতদের ঘোড়াগুলি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভঙ্গিতে দেহখানাকে টান করে ছুটে চলেছে। ফকীরসাহেব বলছিলেন,—

প্রথমেই তো বলেছি বাবুজী, দুনিয়াতে মানুষের পয়দা হবার পর থেকেই শুরু হয়েছে খোদার দুনিয়াকে তাঁর মালিকানি থেকে ছিনিয়ে নেবার লড়াই। শয়তান লড়ছে বাবুজী। শতরঞ্জি খেলার ছকে মানুষকে গুটির মত বসিয়ে লড়াই চলছে। জমিনের মালিকানি ঔরতের মালিকানিই হল শয়তানের দুনিয়া। আছে—আরও কিছু আছে। আছে কড়া আরক, শরাব। বিশেষ করে সে-কালে যখন আমীর উজীর মনসবদার জায়গীরদার নবাব সুলতান রাজা মহারাজা বাদশাহরাই দুনিয়ার সব তখন মুল্কের মালিকানা আর ঔরতের সুরত আর জোওয়ানিই ছিল সব থেকে বড় লোভের সামগ্রী, সব থেকে বড় টোপ। এ টোপ শয়তানের টোপ। মেছুড়ে

যেমন পচা গন্ধওয়ালা খাবার জলে ফেলে দেয় তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে তেমনিভাবেই সে হিন্দুস্তানের দীঘিতে চার করে ছিপ ফেলে বসেছিল।

সেকালে যত লড়াই যত হামলা হয়েছে তা শুধু মুল্ক নিয়ে লড়াই কোথাও হয়নি। সব লড়াইয়েই আগে আছে দৌলত আর ঔরৎ। নাদিরশাহ যাবার সময় জমিন নিয়ে যায়নি, ও নিয়ে তো যাওয়া যায় না, নিয়ে গিয়েছিল সোনা রূপা দৌলত আর নওজোওয়ানী সুরতবালী জেনানী। কম না বাবু লাখো দরুনে। তাবারিখ দেখো তুমি।

পাঞ্জাবে শিখে মুঘলে আফগানে হামলা হয়েছে—লুঠ হয়েছে ঔরত আর দৌলত। শিখেরা জবরদস্ত জাত—ওদের জাত সহজে যায় না। ওরা মুসলমানকেও শিখ করে নেয়। ছিনিয়ে নেওয়া জেনানী ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হিন্দুর মত ফেলে দেয় না। থাক বাবু, এখন যা হয়েছিল শোনো।

রোহিলখণ্ডের লড়াই তখন চরমে উঠেছে। দনাদ্দন কামানের গোলা গিয়ে পড়ছে পাত্থলগড়ের উপর। পাত্থলগড়ে আট আটটা ভারী জবর কামান ছিল। সেগুলো কিন্তু গর্জাচ্ছিল না। কারণ কি বাবুজী যে, তখন ঘাউসগড় পাত্থলগড় ছেড়ে রাতের পর রাতে কয়েকটা গোপনপথে রোহিলারা পালাচ্ছে তরাইয়ের দিকে। পাত্থলগড় ঘাউসগড় থেকে সিপাহী কমে এসেছে। সিপাহী মরেছে সিপাহী জখম হয়েছে সিপাহী পালিয়েছে কিন্তু নতুন সিপাহী আর আসেনি। ভারী কামানগুলো দাগবার জন্যে গোলন্দাজ ছিল ফিরিঙ্গীরা। ফিরিঙ্গীরা গতিক দেখে পালিয়েছে। রোহিলা যারা কামান দাগতে পারত তারা তাদের জায়গায় এসে মরেছে। জখম হয়েছে। নতুন লোক তৈরী হয়নি যারা দাগতে পারে সে কামান। তাই কামানগুলো চুপ।

ওদিক থেকে বিপুল গর্জন করে উঠছে বাদশাহী কামান। দেখতে দেখতে সশব্দে ভারী গোলা এসে পড়ছে কেল্লার গায়ে।

ঘাউসগড় পাত্থলগড় পড়বে, রোখা যাবে না।

গোলাম কাদের সেই দিনই স্থির করেছে রাখবে না কেল্লা, রাখবে না শহর। রাখবার দরকার নেই।

কি দরকার কেল্লা রেখে রুখে? জবিতা খাঁ ইসলাম ছেড়ে শিখধর্ম গ্রহণ করেছে। জবিতা খাঁয়ের নবাবী সুলতানী রাখার কোন জরুরৎ নেই। বরবাদ হয়ে যাক জবিতা খাঁ! কিন্তু নিজের গর্দান বাঁচবে কিসে? শুধু গর্দান নয়, তার সঙ্গে গোলাম কাদেরের চাই জবিতা খানের নবাবী—তার রোহিলখণ্ড। তাই বা হাতে আসবে কিসে?

—বাবুজী! ফিস করে কানের কাছে সে পরামর্শ যুগিয়ে দিল কালাশের।

কালাশের বাদশাহী ফৌজের ছাউনি থেকে শলাহ পাঠালে। শলাহ পাঠাবার কায়দা ছিল তার অনেক। কবুতর বহুৎ পুরানো কায়দা বাবুজী। সারা দুনিয়া ভর্ এ কায়দার চল ছিল। আরও ছিল অনেক কায়দা। ছোকরী ছোকরা ফকীর সন্ন্যাসী এরা যেত আসত। কালাশেরের এক কায়দা ছিল বাবুজী—সে পাঠাতো কুত্তা।

সেই যে কুত্তা, যে-কুত্তাকে গুলবদনী দেখেছিল ওই অমৃতেশ্বরের চত্বরে সেই রাত্রে—সেই কুত্তা। কুত্তাটার রং ছিল মিশকালো আর তার চোখ দুটো ছিল বিল্লীর মত কি শেরের মত নেকড়ার মত বলতে পার। যেন জ্বলন্ত। আর সেই চোখ দুটোর চারিপাশে ছিল দুটো সাদা গোল ঘের। বড় বড় লোম ছিল সে ভয়ংকর কুত্তাটার। সেই লোমের ভেতর নিশান লিখে বেঁধে পাঠিয়ে দিত কালাশের। সে কুত্তাকে আর কেউ ধরতে পারত না—ধরতে পারত এক নবাবজাদা গোলাম কাদের।

কালাশের, বাবুজী, খুদ শয়তান। হজরত রহিমশা নিজে বলেছেন। সে কথা মিথ্যা হতে পারে না। আর মিথ্যাই যদি হবে তাহলে কালাশের এ শলাহ দেবে কেন? কালাশের লিখে পাঠালে —"নবাবজাদা, জলদি করে গড় খুলে দাও। না হলে জান চলে যাবে। মিরজা নজফ খাঁ পরওয়ানা এনেছে তোমার গর্দান পাঠাতে হবে বাদশাহী দরবারে। এখনও সময় আছে। তুমি ভেট ভেজো। তোমার গড়ের অন্দরে তোমার বাবার হারেমের এক বাঁদী আছে যাকে তোমার বাবা বলত 'আঁখো কি রৌশন'—হিন্দুস্তানী নয়ন-তারা। লোকে বলে সে নাকি পরস্তারও ছিল জবিতা খাঁয়ের। তা হোক। যে-আদমী নিজের ধরম ছাড়ে—ইসলাম ছেড়ে শিখ হয় সে-আদমী বরবাদ হয়ে যাক। ওই বাঁদীর নাম নাকি পরভীন-বাঈ; ওই পরভীনবাঈকে সঙ্গে দিয়ে দামী দামী ভেট পাঠাও। ফিরিঙ্গীদের তৈরী শরাব খাঁটি আরক আর দামী কিছু জহরত। তার সঙ্গে আশরফির তোড়া। পাঠাও। মনজুর আলি সাহেবের সঙ্গে শলাহ করেই তোমাকে এ মতলব পাঠালাম। কিন্তু দেরি আর করো না। আর ডরও করো না নবাবজাদা। দৌলত আর ঔরৎ দিয়ে যা মেলে সারা জিন্দগী ফকিরী করে কি তপস্যা করে তা কেউ পায় না। জলদি করো।"

গোলাম কাদের না বলেনি। বলবে কি বাবুজী সে তো নিজেকে তখন বিক্রি করে রেখেছে কালাশেরের কাছে। এ শলাহ তার খুব ভাল মনে হল। আচ্ছা শলাহ।

তার বাপের ওই বাঁদী পরভীন, বহুৎ পেয়ারের বাঁদী। সুরত যেমন তেমনি তার গান তেমনি তার চোখের চাউনি। একটু তেরচা করে চাইলে মনে হয় কলেজায় একটা দমকা হাওয়া এসে লাগল, কি একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল।

পরভীনের বয়স তার থেকে বেশী। বাইশ চব্বিশ হবে।

কাশ্মীরের মেয়ে। লুট হয়ে এসে পড়েছিল লাহোরের বাঁদীর হাটে। সেখান থেকে গিয়েছিল কাবুল; শাহ আবদালীর হিন্দুস্তানী বেগম হজরতমহলের বাঁদী হয়েছিল। সেখানেই শিখেছিল নাচ আর গান। সেখান থেকে এসেছিল দিল্লী। হজরতমহল তাকে পাঠিয়েছিল তার দুই মা বাদশাহ মহম্মদশাহের বেগম মালকাইজমানি আর সাহেবাইমহলের কাছে। পরভীনকে নিয়ে বিপদ হয়েছিল হজরতমহলের। মেয়েটা ছিল বাবুজী এক সর্বনাশী মেয়ে। পুরুষের মধ্যে যেমন কিছু পুরুষের ঔরৎ নিয়ে একটা লালস থাকে, লোভীর লোভের মত লালস মেয়েদের মধ্যেও তেমনি মেয়ে আছে যাদের পুরুষের লালস থাকে। এই পরভীনের এই লালস ছিল এবং লালসটার ঢঙ ছিল আরও বিচিত্র। সে পুরুষ নিয়ে খেলা করতে ভালবাসত। ধরা দিতে চাইত না কিন্তু খেলা করত।

মহীউদ্দিন ঔরংজীবের মত জবরদস্ত মানুষ তার মাসীর বাগানে বেড়াচ্ছিলেন—তাঁকে দেখে একটা হিন্দু বাঁদী হীরাবাঈ—সে লাফ দিয়ে উঠেছিল গাছ থেকে ফুল পাড়বার ছল করে। তাই দেখে ঔরংজীব, শাহজাদা তখন তিনি, একেবারে বেহোঁশ হয়ে গিয়েছিলেন।

বাবুসাহেব, আবদালী বাদশাহের চার বেটাকে নিয়ে পরভীন বাঁদী সেই খেলা খেলতে শুরু করেছিল। বিব্রত হয়ে উঠেছিল হজরতবেগম। মেয়েটার জীবনের ভয় পর্যন্ত ছিল না।

শাহ আবদালীর তখন জীবনের শেষ দিক। তখন তাঁর দেহ ভেঙেছে, রোগ ধরেছে, নাকের ভিতর দুরারোগ্য ঘায়ের আরম্ভ হয়েছে। নাক ফুলেছে। সেই দেহেই আমেদশা আবদালী হিন্দুস্তানে এসে ঢুকলেন। হিন্দুস্তানে বাদশাহী ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে; প্রথমেই পাঞ্জাবে শিখেরা তখন দলে দলে মিলে একটা

শভ্‌ দল হয়ে উঠেছে; ওদিকে দক্ষিণে আবার মারাঠারা উঠে দাঁড়িয়েছে; জাঠ রাজপুত এরাও তখন আর মুঘল বাদশাকে মানতে চায় না। ওদিকে বাংগাল মুল্কে ফিরিঙ্গীরা দেওয়ানী নিয়ে চেপে বসেছে। শা আলম বাদশা এলাহাবাদে বসে বসে আফিং খাচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। কিন্তু দূরিদূরানী শাহ আবদালীও মানুষ। দেহখানা তাঁর রক্তমাংসের; সে রক্তমাংসের দেহ তাঁর ভাঙা তার উপর নিজের আফগান ফৌজ আর সে ফৌজ নাই। সে ফৌজও ভিতরে ভিতরে ভেঙেছে। হিন্দুস্তানে বাদশা নাই। বাদশার মা বহেন বেটাকে আগলে বসে আছে নাজিবউদ্দৌলা। সে নাজিব-উদ্দৌলাও তখন জাঠরাজা জবাহির সিংয়ের সঙ্গে লড়াই করে জখম হয়ে গেছে। তারও কোন হিম্মৎ অবশিষ্ট নেই। এক সেই নাজিবউদ্দৌলা ছাড়া আর কেউ দূরানী বাদশাকে সালামৎ জানাতে এল না। বাদশা আবদালীরও শক্তি হল না সাহস হল না যে তাঁর ফৌজ নিয়ে আর একবার সরহিন্দ থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্তান ঠেলে হিন্দুস্তানের ভিতরে ঢুকে লুঠে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে যান।

বরং হিন্দুস্তানে এসে যেন বিপদে পড়েছেন তিনি। তাঁর চারিদিকে শিখেরা নেকড়া বাঘের মত লুকিয়ে লুকিয়ে রয়েছে; ওত পেতে রয়েছে; প্রতিরাত্রে আফগান তাঁবুর উপর লাফিয়ে পড়ে এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যায়। শাহ আবদালী পাঞ্জাবে ছাউনি ফেলে তাকিয়েছিলেন দিল্লীর দিকে। এমনটা বুঝতে পারেননি দূরানী বাদশা। বুঝতে পারেননি যে—

ফকীরসাহেব আমাকে বলেছিলেন—আবদালী বাদশাহ লড়াই অনেক করেছেন লুঠ করেছেন বহুত খুন করিয়েছেন হাজারো হাজারো লাখো লাখো জান বরবাদ করেছেন; ঔরতে তাঁরও লালসা ছিল। তবু বাবুজী আল্লাকে মানতেন—শয়তান বনে যাননি।

তিনি দেখতে পেলেন আল্লা নারাজ। আরও দেখলেন হিন্দুস্তান গুনাহে গুনাহে শয়তানকে ডেকে এনেছে। এখানে গেলে সর্বনাশ হবে। আল্লা নারাজ!

তিনি ফিরবেন ঠিক করলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন বেগমদের মধ্যে হিন্দুস্তানের বেটীরা। তুমি জরুর জান বাবুজী নাদিরশাহের বেটার সঙ্গে সাদী হয়েছিল এক শাহজাদীর; সে শাহজাদী বিধবা হলে তাকে নিকাহ করেছিল আবদালী বাদশা—আর মহম্মদশাহের বেটী হজরতমহল। এরা সঙ্গে এসেছিল। এদের আপনজনেরা এল বেগমদের সঙ্গে দেখা করতে। হজরত-মহলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বাদশাহ মহম্মদশাহের দুই বেগম মালকাইজমানি আর সাহেবাইমহল।

মালকাইজমানি বাবুজী ফরুকশের বাদশাহের বেটী। তার শলাহ নিয়ে মহম্মদশাহ কামকাজ করতেন। তিনি এসে তাঁবুতে ঢুকেই দেখলেন এই পরভীনকে। সে পাংখা নিয়ে খড়ী ছিল, মাতাজী বেগমসাহেবাকে বাতাস দেবে। চোখ দুটো তার ঝকমক করছিল।

ফকীরসাহেব থেমে গেলেন হঠাৎ। একটু হাসলেন। যেন এমন কিছু হঠাৎ মনে হয়েছে তাঁর যাতে এ হাসি আপনি ফুটেছে তাঁর মুখে। নিজেই বললেন—বার দুই তিন বেশ ঘাড় নেড়ে উপভোগ করে বললেন—বাবুজী, দুনিয়ায় এখানে ওখানে সেখানে আজ কাল পরশু যা ঘটে যাচ্ছে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে—যা মনে হচ্ছে কিছুর সঙ্গে কিছুর সম্বন্ধ নাই তা যদি বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে পরের পর ছকে ছকে গেঁথে সাজিয়ে যাও বাবুজী তাহলে দেখবে একটার সঙ্গে একটা আলগ নয়, সবগুলো একসঙ্গে গাঁথা। বাবুজী, ধুপ হল তাই বরখা এল—বরখা এল

পানি এল হাওয়া হল। ফসল হল। শীত এল। মানুষের জিন্দেগীতেও তাই। নাদিরশা এল তাই আবদালী এল; বরগীরা লাফ দিল। হিন্দুস্তান জখম হল—বাদশাহী খানখান ফাটা বর্তনের মত হয়ে গেল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে ফকীর বললেন—এ লেড়কীও ঠিক তেমনিভাবে সেদিন নসীবের এক ছকে দাঁড়িয়ে ছিল। আর মাল-কাইজমানি তাঁবুতে ঢুকে তাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হজরতবেগম বললেন—ও একটা বাঁদী। পরভীন ওর নাম।

পরভীন মুচকে হেসে হেঁট হয়ে তুসরাবার কুর্নিশ করলে।

মালকাইজমানি বললেন—হাসলি কেন বেয়াদপ বাঁদী কোথাকার!

—কসুর হয়েছে হুজুরাইন। হাসছিলাম নসীবের আক্কেল দেখে। নসীব যে কাকে নিয়ে কি করে কখন!

হজরতবেগম বললেন—ওর তরিবৎ আদপ খারাপ বটে। বার বার সাবধান করে দি। বলি গর্দান যাবে। তবু ওর ভয় নাই। বলে ভুলে যাই। কখনও বলে গর্দান গেলে একবারই যাবে। শাহজাদাদের নিয়ে ওর খেলার শখ।

—ওকে যেতে বল্ এখান থেকে।

বাঁদী পরভীনকে সরিয়ে দিয়ে মালকাইজমানি হজরতমহলকে বলেছিলেন—কোথায় পেলি? কাদের মেয়ে?

—কাশ্মীরী মেয়ে। বাপ মায়ের খবর জানিনে।

—জরুর কোন তওয়াইফের মেয়ে। নাচ গান ভাল জানে। না?

—হাঁ। সেই গুণেই আজও ওর গর্দান যায়নি। বাদশাহ দূরিদূরানী ওকে বলেন কুত্তি। বাদশাহের চার ছেলেকে ও সমানে

টানে। নজরা মারে। আমি ওকে তবু রেখেছি, বাদশাহের পরে যদি কাজে লাগে! আবার ডরও লাগে।

—আমাকে ওকে দিবি?

—কি করবে?

—খেলব।

—খেলবে?

—হাঁ। খেলবার সময় হয়েছে। শাহ আলমকে হটিয়ে—

—বাঁকাকে?

—হাঁ। মহম্মদশাহ বাদশাহের বেগম আমি, আহম্মদশাহ আমার নিজের বেটা নয়—উধমবাঈয়ের বেটা হলেও মহম্মদশাহের বেটা। আহম্মদশাহকে অন্ধা করে ঠেলে দিয়ে আজিজুদ্দিন আলমগীর মসনদ নিয়েছিল। লালকেল্লা থেকে আহম্মদশাহের বিধবা আর শাহজাদা বাঁকাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। সামান্য হাবেলীতে দিন কাটছে। তনখা সময়মত মেলে না। এখন শাহজাদা বাঁকাকে সামনে করে লালকেল্লায় ঢুকবার আর একবার চেষ্টা করব। এ বাঁদীকে তালিম দিলে ও শয়তানকে বশ করে আনবে। পুরুষের লালস এই ধরনের ঔরতের ওপর বেশী। তোর বাপের মন মাল-কাইজমানি ফররুখশের বাদশার বেটীতে মজেনি। সাহেবাইমহল তোর মা—তার রূপ তো দেখেছিস। তাতে ভোলেনি। এক হিন্দু নাচওয়ালীর বেটী উধমবাঈ—তাকে দেখে বাউরা হয়ে গেল। বেটী, আহম্মদশা আমার বেটা হলে কি সাহেবাইমহলের বেটা হলেও এমন করে অন্ধা হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে মরত না। মরল উধমবাঈয়ের বেটা বলে। উধমবাঈ হয়ে গেল বাদশাহের মা। নাচনেবালীর মগজ নিয়ে কি বাদশাহী চালানো যায়? হায় রে হায় রে মুঘলবাদশাহীর নসীব!

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—উধমবাঈ মরেছে।

আহম্মদশা মরেছে—আহম্মদশাহের বেগম এনায়েৎপুরী বেগম বেঁচে আছে আর আছে শাহাজাদা বাঁকা। তারা এখন আমার কব্জায়। দৌলত হীরা জহরত আর টাকাকড়ি যা, তা আমাদের দুই সন্তানের। আমরা নইলে উপোষ থাকতে হয়। আর বাঁকাকে আমি ভালবাসি। তাকে মসনদে বসাতে পারলে সে আমার কথায় চলবে। আমি একবার দেখতে চাই। ওই বাঁদীকে আমাকে দে। ওর মধ্যে শয়তান আছে রে—সে সব কাম হাসিল করে দেয়।

হজরতবেগম দিয়েছিল তাই।

পরভীনও খুশী হয়ে এসেছিল। গর্দান যাবার ভয়েও তার যে-স্বভাব বদলায়নি সে-স্বভাব ভয়ের সামনে থেকে সরে যেতে বহুৎ খুশী হয়ে উঠেছিল। ছায়ার আওতা থেকে রোদে এসে ফলের গাছ যেমন হেসে ওঠে গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে ফুলে ভরে ওঠে তেমনিভাবে হেসে গাঢ় সবুজ ফুলন্ত হয়ে উঠেছিল।

সারা হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লী। দিল্লীতে শয়তানের খাস বাগিচা। দিল্লীর জমিনে দিল্লীর পানিতে দিল্লীর হাওয়াতে তখন শয়তানের জাদু শয়তানের ভেলকি চলছে; সেখানে এসে পরভীন যেন ঝাঁপির সাপ গর্তের মধ্যে ঠাঁই পেলে, পুকুরের মছলি যেন দরিয়ায় ছাড়া পেলে।

শাহাজাদা 'বাঁকা' শাহের রাতের মজলিস গুলজার হয়ে উঠল। বুড়া নাজিবউদ্দৌলা নাদিরশাহী জিন্দিগীর নওজওয়ান—আবদালশাহী আমলের মর্দানা—সে শরাব খেতো না, ঔরতেও ঝোঁক ছিল না। ঝোঁক ছিল মুল্কের মালিকানিতে, লোভ ছিল সোনায় রূপায় জহরতে, আর নেশা ছিল লড়াইয়ে। কিন্তু বেটা জবিতা খাঁয়ের জিন্দিগী আলাদা। সে জিন্দিগী কালাশেরের জিন্দিগী। একই বয়স দুজনের। তার উপর আবদালীর ডানহাত হিন্দুস্তানের মীরবক্সী নজিবউদ্দৌলার বড় বেটা সে, দিল্লীতে তখন বাদশাহের বেটা জোয়ানভক্তের

চেয়েও তার খাতির বেশী। শরাব আর ঔরৎ নিয়ে তার রাত দিন কাটত।

মহম্মদশাহের শাহীবেগম মালকাইজমানি ফরুকশের বাদশাহের বেটী—মহম্মদশাহের বেগম—যে মহম্মদশাহ নওজোওয়ানিতে সৈয়দ ভাইদের খত্‌ম্‌ করেছিল।

সে এ বাঁদীকে ঘরে রাখেনি। শাহজাদা বাঁকা তখন বড় হয়েছে। পরভীন তাকে পাকড়াবার আগেই জবিতা খাঁয়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—জবিতা খাঁ, তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি তোমাদের বংশকেই। কেন জান? নবাব নাজিবউদ্দৌলা বাদশা আবদালীর সব থেকে বড় ভরসা হিন্দুস্তানে। নবাবসাহেবের হিম্মতেই দুশমন শয়তান উজীর গাজিউদ্দিনকে দিল্লী ছেড়ে পালাতে হয়েছে। গাজিউদ্দিন আহম্মদশাহ বাদশাকে অন্ধা করেছে—মহম্মদশাহের বংশকে লালকেল্লা থেকে দূর করেছে। আর সেই মসনদে বসেছিল আজিজুদ্দিন আলমগীর—তারপর এখন আলিগহর শা আলম নাম নিয়ে এলাহাবাদে জানের ডরে লুকিয়ে আছে। দিল্লীর বাদশাহী তক্ত খালি। নাজিবউদ্দৌলা নবাবসাহেব বলে—আমি বুড়ো হয়েছি বাদশাহী—এ নামকে ওয়াস্তে যে বাদশাহী তাই নিয়ে আর খুনোখুনি করতে পারি না। বাত ঠিক জবিতা। কিন্তু এ বাত জরুর বুঢ্‌ঢা আদমীর বাত।

ঠিক এই সময়েই পরভীন এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরওয়াজায় —হাতে ছিল তার পান আতরের থালি; আর তার পিছনে ছিল আর দুই বয়সওয়ালী বাঁদী। সারেঙ্গী আর তবলা বাঁয়া ঘরে রাখাই ছিল, তারা এসে তার সামনে বসল। পরভীন এসে দাঁড়াল জবিতা খাঁয়ের সামনে।

হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করে থালাখানা সামনে নামিয়ে দিয়ে একটু

হাসলে। সে হাসি চমকে ফুটে ওঠে বিদ্যুতের মত এবং তেমনিভাবেই মিলিয়ে যায়।

ফকীরসাহেব বললেন—মালকাইজমানি জানতেন যে জবিতা খাঁয়ের কাছে কোরান কি ইসলামের কোন দাম নেই। শুধু জবিতা খাঁ কেন সে সময়ে অধিকাংশ মানুষই ওইরকমের ছিল। তবুও মালকাইজমানি তাকে কোরান ছুঁয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, মীরবক্সী হয়ে জবিতা খাঁ শাহজাদা বাঁকাকে মসনদে বসাবে।

সেই হলফ করিয়ে পরভীনকে দিয়েছিলেন জবিতা খাঁকে। বলেছিলেন—মসনদে বসালে দশ লাখ রূপেয়া আমি দেব। তুমি পাবে।

একখানা একরারনামাও তৈরী হয়েছিল।

গোপনে ডেকে পরভীনকে বলেছিলেন—দেখ্ রোহিলা পাঠানের বাচ্চা—জবরদস্ত বটে দুর্দান্তও বটে কিন্তু বুরবক আর বেওকুফ; দিল ওদের নাই। তোকে বাত দিচ্ছি শাহজাদা বাঁকা মসনদে বসলে তোকে ফিরিয়ে আনব। বাদশাহের পরস্তার করে দেব। যেমন ঔরংজীব বাদশার ছিল উদিপুরীমহল। বল—তুই ওকে কব্জায় এনে এই কাম করাবি।

পরভীন কুর্নিশ করে বলেছিল—কিসের কসম খাব বলুন বেগমসাহেব!

মালকাইজমানি বলেছিলেন—খুদা কসম।

ও ছাড়া কসম খুঁজে তিনি পাননি।

পাওয়া যায় না বাবুসাহেব। যদি কসম কি হলফের কিছু দাম থাকে তবে খুদার নামেই তার দাম। তার বাইরে কোন দাম নেই।

*　　　*　　　*

এ বাঁদী সেই বাঁদী। পরভীন। জবিতা খাঁ তাকে নিয়ে

মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। শরাব নাচা আর গানা। তার জন্যে মজলিস লাগে না। ফরাশ লাগে না। বাবুজী, তখন দিল্লীর আর হিন্দুস্তানের হালৎ এমনি হয়েছে যে আমীর নবাবের মজলিস চলেছে তো চলেছে—এক দিন দু দিন সেইখানেই খানা সেইখানেই পিনা সব সেইখানে। সে ঘরে চলেছে বাগবাগিচায় চলেছে, যম্‌নার উপর বজরায় চলেছে, আবার বাবুজী যম্‌নার কিনারায় বালির উপর বসেছে শরাব নিয়ে। হল্লা করেছে—তরবুজা খরবুজার ক্ষেতি হয় যম্‌না কিনারে—সেই তরবুজা খরবুজার ক্ষেত লুঠ করেছে হারেমের বিবিরা —আমীর মেজাজ খুশ্‌ করেছে। জবিতা খাঁ এই পরভীনকে সকলের উপর টেক্কা দিয়েছিল।

বাবুজী, খোজা সিপাহী আর তাতারনী ঔরৎ সিপাহী পাহারার মধ্যে জবিতা খাঁ আর এই বহুৎখুবসুরতী নওজোওয়ানী পরভীন পুরা নাঙ্গা হয়ে পড়ে থাকত নেশায় বেহোঁশ হয়ে।

নবাব নাজিবউদ্দৌলা বেশী দিন বাঁচেননি। বাঁচলে বেটার সঙ্গে ঝগড়া বাধত।

এ ঔরৎ সেই ঔরৎ—পরভীন বাঁদী। জবিতা খাঁ ওকে আদর করে বলত আঁখো কি রোশন—হিন্দুস্তানী নয়নতারা।

ঘাউসগড় তখন পড়োপড়ো। দনাদ্দন কামানের গোলাগুলো গিয়ে পড়ছে শহরে কেল্লার পাঁচিলে গড়খাতের জলে; ভাঙছে—কিছু ভেঙেছে; শহরের লোকেরা প্রায়ই ভেগেছে; শহরের বস্তি বাজার পুড়ছে; রোহিলা সিপাহীরাই লুটছে। এরই মধ্যে ঔরৎ চিল্লাচ্ছে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সিপাহীরা। এরই মধ্যে শহরে ঢুকল সেই কালো কুত্তাটা। যেটাকে দেখলে লোকে ভয় খায়। যার চোখ দুটো ধ্বকধ্বক করে আঙরার মত। যার সর্বাঙ্গে ঘন কালো রঙের বড় বড় রোঁয়া। আর ওই ধ্বকধ্বকে চোখ দুটো আশ্চর্য দুটো

সাদা গোল ঘের দিয়ে ঘেরা। শহর থেকে ঢুকল গিয়ে কেল্লার ভিতরে।

তারই রোঁয়ায় বাঁধা ছিল চিঠি।

গোলাম কাদের সেই চিঠি পড়লে। কালাশের চিঠি লিখেছে।—

"নবাবজাদা গোলাম কাদের, জলদি করে গড়ের দরজা খুলে দাও। মিরজা নজফ খাঁ বাদশাহী পরওয়ানা এনেছে কি গড় দখল করে তোমার গর্দান নিয়ে বাদশাহের কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু কোন ডর নাই। আমি আছি। দোস্ত মনজুর আলি আছেন। এক কাম করো। তোমার বাপের হারেমের এক বাঁদী আছে যাকে তোমার বাবা বলত আঁখো কি রোশন—হিন্দুস্তানী নয়নতারা। পরভীন-বাঈ। লোকে বলে সে নাকি তোমার বাপের পরস্তার ছিল। তা হোক। যে আদমী ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। আর তার পরস্তার—তার সঙ্গেই বা সম্বন্ধ কি? নবাবজাদা, দুনিয়াতে দুটো জিনিসের নামে জিন্দিগী চলে। দৌলত আর ঔরৎ। জওহরৎ আর ওই ঔরৎ পরভীনকে ভেট ভেজো। এক কাম করো। জনাব লতাফৎ খাঁ উজীর আবদুল আহাদ সাহেবের মুখতার ও মুশীর। উজীরের তরফ হয়েই সে এসেছে। সে খোজা। তার উপর আমীর গানবাজনার এলেমদার লোক লতাফৎ খাঁ। সুতরাং পরভীনকে তার কাছে পাঠালে এমন কোন বদনামী তোমার হবে না। জলদি করো! ডর করো না। আমি জরুর বাঁচাবো তোমাকে!"

গোলাম কাদেরের বয়স তখন সবে ষোল সতের।

বাবুজী, ওই যে বামনওলী গাঁওয়ে সেই গুলবদনীকে অসহায় মুগ্ধ অবস্থায় পেয়ে তার উপর সেই যে হরিণের উপর বাঘের ঝাঁপ দেওয়ার মত ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তার বছর খানেক পর। বছর খানেক ঘাউসগড়ে থেকে সে কেল্লা রেখেছে, সারা ঘাউসগড়ের কেল্লাদারি

করেছে। বয়স সতের হলেও সে মনে মনে বেড়েছে। সে এ শলাহকে আচ্ছা শলাহ বলে আঁকড়ে ধরলে। হুকুম দিলে—ভেট সাজাও।

পরভীনকে ডেকে বললে—আপনার যা আছে গুছিয়ে নাও। তোমাকে যেতে হবে মুঘল ছাউনি।

পরভীন খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—বহুৎ আচ্ছা। যাব। কিন্তু ও খোজার কাছে পাঠাচ্ছ কেন?

কাদের বললে—খোজা লতাফৎ খাঁয়ের তাঁবু থেকে মীরবক্সী মিরজা নজফের তাঁবু তো দূরে নয়। আর লোক আছে—ওখান থেকে সে তোমাকে মীরবক্সীর হারেমে পৌঁছে দেবে।

—আচ্ছা কাম কি? নজফ আলিকে খুশী করে ঘাউসগড় খালাস করতে হবে, নবাবজাদাকে ফরমান দেওয়াতে হবে?

—আরও কিছু আছে।

—ফরমাইয়ে।

—মিরজা নজফই আজ দিল্লীর বাদশাহীর সব থেকে বড় খুঁটো —খুঁটোটা বৃহৎ জবরদস্ত। মজবুদ। ওটাতে ঘুণ ধরাতে হবে। ঔরতে শখ নেই, শরাব ছোঁয় না। লোকটা কোরান মাথায় দিয়ে নিদ যায়।

ঘাড় বেঁকিয়ে মুচকে হেসে পরভীন বলেছিল—মিরজা নজফকে জহান্নমে পাঠাতে হবে?

—হাঁ।

—কি বকশিস মিলবে?

—নজফ খানের কলেজা।

তার দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই অপরূপ মোহময়ী মেয়েটা বলেছিল—তুমি যখন রোহিলখণ্ডের মালেক হবে তখন আমি ফিরে আসব—তখন তোমাকে আমি চাইব নবাবজাদা।

গোলাম কাদেরও ভয় পেয়েছিল এ কথায়।

মেয়েটা হেসে উঠেছিল।

শুধু তাই নয় বাবুজী।—ফকীরসাহেব বললেন—সে ঔরং ঔরং নয় শয়তানী—সে সেই দিনই গোলাম কাদেরকে জহান্নমের মুখে রওনা করে দিয়ে বলেছিল—বন্দেগী নবাবজাদা, আমি যাব। আর তোমার কাম আমি হাসিল করে দেব।

(বারো)

আপত্তি করেছিল গোলাম কাদেরের মা। বলেছিল—ইজ্জৎ চলে যাবে। এ হয় না।

গোলাম কাদের বলেছিল—একটা বাঁদীর জন্যে ইজ্জৎ যায় না। সে পরস্তার হলেও যায় না। ইসলামের জিন্দাপীর ঔরংজীব বাদশা তার মাসীর খসম মেসোর পরস্তার বাঁদী-বেগম হীরাবাঈকে দেখে দেওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের এক পরস্তার ছত্তর-বাঈকে মেসোকে বদলা দিয়ে হীরাবাঈকে হারেমে এনেছিল। মৌসীর সতীন ছিল হীরাবাঈ। এ দেশের কাফেররা তো তাকে মৌসীই বলে। তাতে ঔরংজীবের গুনাহ হয়নি—ছত্তরবাঈকে মেসোকে বদলা দিয়েছিল বলে ইজ্জৎ যায়নি। জিন্দাপীর শাহানশাহ আলমগীর বাদশাহের চেয়ে বড় ইজ্জৎ রোহিলাদের নয়। এ হতেই হবে। পরভীন যাবে।

মা অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

গোলাম কাদের আবার বলেছিল—আমি তাকে পাঠাচ্ছি উজীরের মুখতিয়ার-ই-মুশীর খোজা লতাফৎ খাঁ সাহেবের কাছে। তারপর সে যদি কাউকে বেচে কি খেলাত দেয় সে কথা আলাদা।

মা এতক্ষণে কথা বলেছিল—নজফ খাঁ মানবে ?

—মানবে।

বাবুসাহেব !

নজফ খাঁ মেনেছিল। মানতে হয়েছিল তাকে। ঘাউসগড় থেকে যখন ভেট এসে পৌঁছুল তখন উজীরের মুখতিয়ার-ই-মুশীর লতাফৎ খাঁ আর মীরবক্সী মীর নজফ খাঁ বসেছিল লতাফৎ খাঁর তাঁবুতে। বান্দা আর বাঁদীরা খুঞ্চিপোষ দিয়ে ঢাকা পরাতগুলি সামনে ধরে দিল, বান্দাদের সর্দার একে একে খুঞ্চিপোষগুলি তুলে সরিয়ে নিল। সোনার কামদার বানারসী, ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরী গালিচা, মখমল, চন্দনকাঠের বাক্সে জহরত, মখমলের থলিতে আশরফি—একটা একটা করে খুলে দেখাচ্ছিল সে। এমন সময় তাঁবুর দরজায় লাগল এক মখমলে ঢাকা ঝালরদার পালকি। তার দুই দিকের দরজা ধরে জনকতক বাঁদী। তারাও নওজোওয়ানী। তারাই পালকির দরজা খুলে দিল। পালকি থেকে বেরিয়ে এল পরভীন। সূক্ষ্ম ওড়নায় ঢাকা মুখ। যেন কুয়াসায় ঢাকা মনে হচ্ছে। কিন্তু মুখখানা এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল গোলাপী যে কুয়াসার মত সফেদ সূক্ষ্ম ওড়নার আবরণকে ভেদ করেও ফুটে উঠেছে তার গোলাপী জৌলুস।

লতাফৎ খাঁ আর মিরজা নজফ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এই আশ্চর্য মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তার ওড়নাটিকে ঈষৎ ফাঁক করে একবার তাকালে লতাফতের দিকে একবার তাকালে মিরজা নজফের দিকে।

তারপর সেই আশ্চর্য ঔরৎ বাবুজী এগিয়ে এসে দুই বাদশাহের দুই আমীরের সামনে অল্প নীচু হয়ে কুর্নিশ করে আস্তে তার ওড়নাখানা মাথার উপর তুলে দিয়ে হেসে বললে—

জনাবআলি উজীরসাহেবের মুখতিয়ার আমীর লতাফৎ খাঁসাহেব আর মীরবক্সী খান-ই-খানান নজফ খান আমীর-উল-উমরা জনাব-আলি—এ বাঁদীর নাম পরভীন বেগম। নবাবসাহেব জবিতা খান সর্দারজীর আমি পরস্তার বেগম। আমি এসেছি ঘাউসগড়ের তরফ থেকে।

এই সময়েই এসেছিল কালাশের। বাদশাহী হারেমের নাজির খোজা মনজুর আলি সাহেবের খাস মুন্সী হিসেবে সে এখানে মোতায়েন ছিল।

বাবুজী, পরভীন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল রানীর মত; এতটুকু দিল্লগী তার তরিবতের মধ্যে দেখা যায়নি। শুধু তাকিয়েছিল সে নিঃসংকোচে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে।

সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল।

পরভীন আবার বলেছিল—এই সামান্য ভেট পাঠিয়েছেন নবাবজাদা আপনাদের জন্যে। এ সব কেবল আপনাদের জন্যে। জনাবআলি—। চোখের দৃষ্টি নামিয়ে পরভীন বলেছিল—জনাব-আলি, আমিও ভেট। এককালে নবাবসাহেব জবিতা খানের পরস্তার ছিলাম; আজ ঘাউসগড় পড়বে; ঘাউসগড়ের কেল্লার হারেমে রোহিলখণ্ডের নবাব নাজিবউদ্দৌলা সাহেবের বুড়ী বেগম থেকে বেটা বহু অনেক আছে। তাদের ইজ্জতের দাম হিসেবে আমি এসেছি—আমিও ভেট।

ঘাউসগড়ের কেল্লার মধ্যে রোহিলা নবাবসাহেবের বেগম বেটা বেটী মেহমানদের জান ইজ্জত এর জন্যে আমি এসেছি। আমার দাম।

বলে আবার সে কুর্নিশ করেছিল।

হঠাৎ যেন নজফ খানের চমক ভেঙেছিল। মিরজা নজফ খাঁ যেন একটা নেশা থেকে কি একটা ঘুমের ঘোর থেকে কাটিয়ে উঠে

একটু নড়েচড়ে বসেছিল। তারপর বলেছিল—বাদশাহের কাছে সওয়ার পাঠিয়ে মত নিতে হবে খানসাহেব। আর এ ঔরৎকে নিয়ে আমরা কি করব ?

লতাফৎ কিছু বলবার আগেই পরভীন বলেছিল—জনাবআলি খান-ই-খানান আমীর-উল-উমরা মীরবক্সী খানবাহাদুর আরও কিছু বলবার আমার আছে। আমি হাটে কেনা বাঁদী। কিন্তু আমি নাচগান জানি—দিল খুশ করতে পারি। আমি জনাবআলির কথা জানি।

নজফ আলি উঠে চলে গিয়েছিল বাবুজী।

* * *

মিরজা নজফ আলি খাঁ আপনার দেমাকে উঠে চলে গিয়েছিল। তা তাকে সাজত বাবুজী। তেমনি শক্তপোক্ত সাফা মানুষ ছিল নজফ আলি। ইরানী 'আমীরের ঘরের ছেলে—এদেশে বচপনে এসেছিল। বড় গরীব ছিল। হিন্দুস্তানে মুরুব্বী কেউ ছিল না। তার মা বলে দিয়েছিল—মুরুব্বী দুনিয়ায় একমাত্র পয়গম্বর রসুল। তাঁর হুকুমৎ কোরানের কানুন মেনে চললে পয়গম্বর খুশী হয়ে খুদাতায়লার কাছে পেশ করেন তার জন্যে আর্জি। বলেন—মালিক ফলানা ইনসান বহুত গরীব কিন্তু তবু কোরানের কানুন মেনে চলে। এর নসীব বদলানো উচিত। খুদা হুকুমৎ জারি করেন নসীব বদল্ যাক। নসীব বদলে যায়।

নজফ আলি খাঁ হিন্দুস্তানে এসে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে নোকরি নিয়েছিল। কিন্তু নবাব সুজা ছিল শরাব আর ঔরতে আসক্ত। সেখান থেকে নজফ গিয়েছিল বাংলা মুল্ক। নবাব কাসেম আলি খাঁর পল্টনে কাজ নিয়েছিল। তাবারিখ তুমি তো জান বাবুজী। ইতিহাসে তো সব খুলে লেখা আছে—বাংলা মুল্কে প্রথম পত্তন হল ফিরিঙ্গীশাহীর। মীরজাফর খাঁ বেইমানি করেছিল নবাব

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে। তারপর মীরজাফরকে ঠেলে নবাব হল মীরকাসেম আলি খাঁ। সেই প্রথম আর সেই শেষ চেষ্টা করলে ফিরিঙ্গীকে হঠাবার জন্যে। মকসুদাবাদ থেকে নবাবী মসনদ উঠিয়ে নিয়ে গেল মুংগেরে। নতুন ধাঁচে নয়া ছাঁচে পল্টন তৈয়ার করলে।

তখন সারা হিন্দুস্তানে ফিরিঙ্গীরা চমক লাগিয়া দিয়েছে। ফিরিঙ্গী ফৌজী কানুন কুচকাওয়াজ কায়দা যেমন চোখ ধাঁধায় তেমনি মজবুদ তাদের কায়দা—তার সঙ্গে তাদের নতুন বন্দুক তাদের কামান তাদের বারুদ গোলা। হিন্দুস্তান জুড়ে মুল্কে মুল্কে সাড়া পড়ে গিয়েছে ফিরিঙ্গী সিপাহসালার মীরআতীশ গোলন্দাজ রাখবার। তারা নয়া কায়দায় ফৌজ তৈয়ার করছে। মীর-কাসেম আলি খাঁ এনেছিল দুজন ফিরিঙ্গীকে—আর্মানী ফিরিঙ্গী সমরু আর গুরগিন দুই ভাই এসে কাসেম আলির পল্টন তৈরি করছিল। মীর নজফ আলি তখন নওজওয়ান—সবে বিশ-বাইশ বছর বয়স হয়েছে—সে কাসিম আলির নোকরি নিয়ে এই কায়দা দেখলে এই কায়দা শিখলে। আর ঘরে ছিল তার এক বড়ীবহেন খাদিজা সুলতানা—সে ঔরৎ হয়েও ছিল ফকীর। সাদী করেনি। তসবী জপত আর ভাই মীর নজফের জন্যে ডাকত পয়গম্বর রসুলকে।

গোঁড়া মুসলমান মীর নজফকে পয়গম্বর মেহেরবানি করলেন। খুদার হুকুমে তার নসীব বদলাল। বক্সারের লড়াইয়ে মীরকাসেম সুজাউদ্দৌলা শাহজাদা আলিগহর ইংরেজ ফিরিঙ্গীর কাছে হারল, মীরকাসেম পালাল; সুজাউদ্দৌলা ফিরে গেল লক্ষ্ণৌ; শাহজাদা আলিগহর ইংরেজকে বাংলার দেওয়ানী দিয়ে এলাহাবাদের কেল্লাতে বসে রইল; ইংরেজ তাকে আটকেও রাখলে। ওদিকে দিল্লীতে নাজিবউদ্দৌলা জবিতা খাঁও চাইলে না যে বাদশা শাহ আলম ফিরে আসুক। তখন মীর নজফ এসে নোকরি নিলে বাদশাহের।

মীর নজফ ফারাক্কাবাদে বাঙ্গাশ নবাবের কাছে পেশকস আদায় করে পাথলগড় দখল করে বহু দৌলত আসবাব নিয়ে দিল্লী গিয়েছিল। সে দৌলত সে আসবাব দিল্লীর লালকেল্লায় দিল্লীর ওমরাহদেয় হাবেলী মঞ্জেল থেকেই লুঠে আনা। তারপর এই ক'বছরে জাঠ রাজাদের গুজর জমিদার রাজাদের সঙ্গে লড়াই করে বাদশাহী অধিকার কায়েম করেছে। সঙ্গে সঙ্গে খাজনা আদায় করেছে। এই তিন চার বছরে দিল্লীর বাদশাহীর যেন পোশাক বদলেছে ঢঙ বদলেছে, সেই পুরানো ছেঁড়া পোশাক আর গরীবানি তাজ যেন বদলেছে।

বাবুজী, মারাঠা বর্গীরা যদি বাদশাহের আয় না শুষতো তাহলে বাদশাহীর হাল এরই মধ্যে সত্যিই ফিরে যেত। সিন্ধিয়া মাহাদজী তার পল্টন নিয়ে দিল্লী থেকে মথুরা আগ্রা ওদিকে রাজপুতনা পর্যন্ত ছাউনি করে বসে ছিল—তারা বাদশাহকে রক্ষা করত।

নজফ আলি বর্গীদের হঠিয়ে দিল্লী বাদশাহীর পুরা ভার তখনও নেয়নি। নিতে হয়তো পারত। যদি উজীর আবদুল আহাদ তার সঙ্গে দুশমনি না করত। উজীর আবদুল আহাদ আর মিরজা নজফ খাঁর ভিতরে ভিতরে দুশমনির সীমা ছিল না। উজীর আর মীরবক্সীর দুটো দল তখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে।

বাবুজী, হজরত রহিমশা বলেছিলেন আমার গুরুকে, তাঁর মুরিদকে,—দেখ বেটা, যখন আমার পরমাত্মা তোমার পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে চাইবে তখন জানবে এ জিন্দিগীর মালিক খুদা মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর রসুল। মানুষের মনে হিংসা আছে বেটা, দুশমনি থাকে তার মনে, ও নিয়েই জন্মায়; ওই দুশমনি খুদার জিন্দিগীতে হার মানে। আর যখন দুশমনি তুফান হয়ে ওঠে তখন বুঝো জিন্দিগী শয়তানের। দুশমনি আর শয়তানি দুইয়ে মিলে

এক হয়ে গিয়েছে বাতাস আর আগুনের মত, ঝড় আর বাদলের মত, নদীর বানের মত। বেটা, বেমারী মানুষের হয় আবার আরামও হয়। কিন্তু বেমারী আর মৃত্যু এক হলে যা হয় তাই হয় দুশমনি আর শয়তানি এক হলে। মানুষের উপর তখন শয়তান ভর করে।

রহিমশা বলেছিলেন এই দুশমনির মধ্যে দিয়ে নজফ খাঁ শয়তানের হাতে পড়ল। যে পরভীনকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিল সেদিন সেই পরভীনকেই সে তার হারেমে নিয়ে এল নিজে উপযাচক হয়ে।

একেই বলে শয়তানের খেল!

*　　*　　*　　*

মীর নজফ খাঁ ঘাউসগড় ফতে করলে পরের দিন ভোরবেলা। শহর পড়ল। নজফ খাঁয়ের ফৌজ গিয়ে শহরে ঢুকল। লতাফৎ খাঁয়ের ফৌজেরাও ঢুকল—লুঠল শহর। দু দিন পর পড়ল কেল্লা।

তখন মাহাদজী সিন্ধে এসেছে তার বর্গী পল্টন নিয়ে। নজফ খাঁয়ের ফৌজ গড়ের মধ্যে ঢুকে বিলকুল সব তছনছ করে লুঠে নিলে। মাটি মেঝে খুঁড়ে ফেললে। দৌলত বের হল। তার সঙ্গে জবিতা খাঁয়ের বেগম আর বেটাদের বন্দী করলে। তারই মধ্যে থেকে সিপাহীরা হারেম থেকে বোরখাপরা জঙ্গী আফগান সর্দার আফজল খাঁকে টেনে নিয়ে এল।

মীরবক্সী মিরজা নজফের সামনে এনে তার বোরখা খুলে তার বড় বড় কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা মুখখানাকে দেখিয়ে বললে —ইয়ে দেখিয়ে খুদাবন্দ ক্যায়সা এক খুবসুরতি রোহিল বেগমসাব! এমন খুবসুরতি হুরী আমরা আমাদের জিন্দগীতে কখনও দেখিনি।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল।

রোহিলা মেয়েরা পর্যন্ত লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিল।

তাদের একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল গোলাম কাদের। সেও লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। সে হঠাৎ এসে বলেছিল—আমার গর্দান নেবার পরওয়ানা আছে শুনেছি—আমার গর্দান নিয়ে মেহেরবানি করুন মীরবক্সী।

হয়তো তাই হত। কিন্তু কালাশের এসে নজফ আলিকে চুপি-চুপি কিছু বলেছিল। মীরবক্সী নজফ আলি তাকে সসম্মানে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল।

কালাশেরেরা কখনও লোভ দিয়ে ভোলায় কখনও কাম দিয়ে ভোলায়; কখনও রাগ দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাম হাসিল করে শয়তান। আর এসবের পিছনে দেমাক তো আছেই বাবুজী!

মীরবক্সীকে কালাশের চুপিচুপি বলেছিল—জনাবআলি, গর্দান গেলে ওর পেটের মধ্যে যে কথাগুলো আছে সেগুলো হাওয়ার সঙ্গে হারিয়ে যাবে। ঘাউসগড়ের দৌলতখানার খবর যদি নিতে হয়—।

এর বেশী সে বলেনি—তাতেই এই হুকুম হয়ে গিয়েছিল।

নজফ খাঁ ঘাউসগড় থেকে হাতি উট ঘোড়া কামান বন্দুক গাড়ি গাড়ি তাম্বু শামিয়ানা এমন কি তামা লোহার পিতলের বর্তন পর্যন্ত লুঠে নিয়ে এসেছিল। আটটা বড় ভারী কামান এনেছিল—যা ছিল এককালে বাদশাহী ইজ্জৎ—পরে নাজিবউদ্দৌলা সেগুলোকে এনে ঘাউসগড়ের বুরুজে বসিয়ে রোহিলা ইজ্জৎ গড়ে তুলেছিল।

বাবুজী, এরই মধ্যে কেমন করে শয়তানের খেল চলে তা বুঝুন।

একটু হেসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে ফকীরসাহেব বললেন—বহুৎ আচ্ছা খেল। বড়া ভারী মজাদার।

সন্ধ্যেবেলা মীরবক্সী মিরজা নজফ আলি আপনার তাঁবুতে বসেছে—ঘাউসগড় লুঠ করা সোনার শামাদানে বাতি জ্বেলে রোশনাই করা হয়েছে, এমন সময় আফ্রিসিয়ার খাঁ মিরজা নজফের মনসবদার পেয়ারের তাঁবেদার, সে এসে বললে—ওই লুচ্চা উজীর আবদুল আহাদের ওই খোজা মুনসী না মনসবদার লতাফৎ খাঁ জনাবআলিকে অপমান করে কথা বলবে আর তাই আমাদের শুনতে হবে ?

দপ্ করে জ্বলে উঠল নজফ খাঁ।—কি ? কি বলেছে ? বেইজ্জতি করে কি বলেছে ?

—জনাবআলি হুকুম দিলে তবে বলতে পারি। বহুৎ বেইজ্জতির কথা॥

—বল এখুনি বল।

—বলেছে দেখো বাবা খুদার হিস্যা ভাগ। আমার মালিক উজীরসাহেবের জন্যে পরভীন বেগম আর মিরজা নজফের জন্যে দাড়ি গোঁফওয়ালা আফজল খাঁ বেগম। সূক্ষ্ম বিচার। কেন জান ? মিরজা নজফ হিজরা !

মিরজা নজফ যেন বারুদে আগুন লেগে জ্বলে উঠল।

তার তলোয়ারখানা খোলা অবস্থায় তোলা ছিল। সেখানাকে টেনে বের করে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে পড়ল। নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মিরজা নজফ হাঁক মারলে—কোথায় ? কোথায় সেই খোজাটা ! কোথায়— ?

তার সঙ্গে ছুটল আফ্রিসিয়ার খাঁ। সঙ্গে সঙ্গে দশ বিশ নাশাক্‌চি (সিপাহী) ছুটল। মিরজা নজফ তাদের দিকে ফিরে বললে—দূরে দাঁড়িয়ে থাক। একটা খোজা গোলাম—তাও সে এক লুচ্চার গোলাম—তার সঙ্গে লড়তে দুসরা আদমীর সাহায্য

দরকার যার হয় সে মর্দানা নয়। বলেই ঢুকে গেল লতাফৎ খাঁয়ের খাস তাঁবুতে।

তাঁবুর দরজায় পাহারা পড়েছিল। খোজা লতাফৎ তখন আর গোলাম নয়, সে তখন আমীর। পাঁচ হাজার মনসবের মালেক; খুদ উজীরসাহেবের একান্ত বিশ্বাসী কর্মচারী। কিন্তু মীর নজফ খাঁ তখন মুঘলিয়া দরবারে ভয়ের মানুষ। তাকে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দেখে তারা শোরগোল তুললে কিন্তু বাধা দিতে সাহস করলে না। নজফ খাঁ তাঁবুর ভারী পর্দা ঠেলে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

তাঁবুর ভিতর সে এক দুরন্ত ভয়ের জায়গা। তাঁবুর ভিতর ঢুকলেই চারিদিকে পাঁচিল উঠে গেল। আর তাঁবুর গায়ে গায়ে যদি সিপাহী থাকে তবে খতম্ হয়ে গেল যে ঢুকল সে। রাগের মাথায় এসেও এ হুঁশ এবং হুঁশিয়ারি তার ছিল; সে তাঁবুর দরজার মুখেই থমকে দাঁড়াল।

তাঁবুর মধ্যে একটা নিভৃত আসর পড়েছিল। একটা গালিচার চারিপাশে চারটে মানুষ-ভর-উঁচু বাতিদানে মোটা মোমবাতি জ্বলছে। চারটে বাতিদানে চার রঙের কাচের ফানুস। চার রঙের আলো মিশে সে এক রঙের মায়া সৃষ্টি করেছে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে মদের নেশায় ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে অর্ধউলঙ্গ পরভীন। এবং তাকে হাতে ধরে টানছে পলায়নপর লতাফৎ খাঁ। পরভীন যেন পালাচ্ছিল না—পালাতে চাচ্ছিল না; সে ফেরে দেখছিল এ দরজায় যে ঢুকছে তাঁকে।

বাবুজী! ফকীরসাহেব বললেন—আপনার মনে-মনে তসবীর এঁকে নিন। শিরাজীর নেশা আর নওজোওয়ানীর খোওয়াব এক-সঙ্গে মিশে তার এই বড় বড় চোখ দুটো ঢুলুঢুলে করে দিয়েছে; রেশমের মত চুল তার সে সময় বাঁধা ছিল না; তাজা গোলাপের

পাঁপড়ির মত তার রঙ আর তেমনি তার চামড়া মাখনের মত নরম এ দেখলেই বোঝা যায় ; তার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত যা ঢাকা ছিল ওড়না পাঞ্জাবি সব খোলা। বাবুসাহেব, এই যারা খোজা হত সেকালে তাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে লোকের। খোজাদের মধ্যে অনেক আমীর ছিল খানখানান ছিল বড় বড় মনসবদার ছিল সর্দার ছিল। তারা বাবুজী সাদী পর্যন্ত করত। বাড়িতে ঔরৎ রাখত। বাদশাহী নবাবী হারেমে এরা অনেক কেলেঙ্কারি করেছে।

*   *   *

ফকীরসাহেবের একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল সেদিন। তিনি বলেছিলেন—বাবুজী, কেলেঙ্কারী আর কি? মর্দানা আর জেনানা, পুরুষ আর মেয়ে এ যার ইচ্ছাতে দুনিয়ায় হয়েছে তারই পরওয়ানা জারি করা আছে কি মর্দানা ঔরৎকে চাইবে, ঔরৎ মর্দানাকে চাইবে। এ চাওয়াতে দোষ কিছু নেই। দোষ ওখানে নাই। কি করবে ওই খোজারা? আমীর সুলতান বাদশাহেরা নিজের গরজে ওই খোজা কিনত। তাদের বুকের ভিতর তো বাবুজী মর্দানার সাধ আহ্লাদ থাকত। কি করবে তারা?

লতাফৎ খাঁ ছিল খোজা—সে আপনার এলেমের জোরে গোলামী থেকে খোলসা পেয়ে হয়েছিল উজীরসাহেবের ডান হাত। আমীরের দৌলত ছিল তার, ক্ষমতা ছিল তার। তা যখন ছিল তখন সে সাধ করবে না কেন বল।

সেদিন ঘাউসগড় ফতে হয়েছে। লড়াই শেষ! লুঠ হয়েছে তার বখরা পেয়েছে, তার উপরে সে পেয়েছে ভেট।

ভেট যা এসেছিল তার মধ্যে যা ছিল হীরা মতি পান্না নীলা জহরৎ—যা ছিল সোনা রূপা সে সব বাদশাহী মালেকানায় গিয়েছে। নজফ খাঁ এগুলো ছাড়েনি। কিন্তু খানাপিনার চিজবিজ

কড়া আরক ফিরিঙ্গী মুল্কের শরাব এসব নিয়েছে লতাফৎ খাঁ ; তার সঙ্গে ভেটের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী ওই ঔরৎ—ও কাশ্মীরী নওজওয়ানী ওই পরভীন বেগম। নজফ খাঁ তাকে মুখ ফিরিয়েছে —কদর বোঝেনি কিন্তু খোজা লতাফৎ তার কদর বুঝেছে। সে তাকে পাঠাবে উজীর-উল-মুল্ক আবদুল আহাদের কাছে। তার আগে যতটুকু তার শক্তি আছে ততটুকু সে ভোগ করে নিতে চেয়েছিল।

শিরাজী খেতে শুরু করেছিল সন্ধ্যে থেকে।

পরভীন নিজে বীন বাজিয়ে গান শোনাচ্ছিল। সেই ঢেলে দিচ্ছিল ফিরিঙ্গী মুল্কের শরাব। লতাফৎ খাঁ প্রথমেই সে শরাবের পাত্র তুলে ধরছিল পরভীনের মুখে।

পরভীন হেসে কিছুটা খেয়ে ঠেলে পাত্রখানা এগিয়ে দিচ্ছিল লতাফৎ খাঁর মুখের কাছে।

বাবুজী, হজরত রহিমশা তাঁর মুরিদকে বলেছিলেন—রহমৎ, খুদ শয়তান তখন সেই তাঁবুর মধ্যে এসে তার গদ্দি পেতেছে! সেই গদ্দির উপর বসে বসে যেমন করে বাদশাহ রাজারা জাদুর খেল দেখে, যেমন করে নাচবালীদের নাচ দেখে তেমনি করে এই মাতোয়ালী নওজোয়ানী আর ওই খোজার বেশরমী জানোয়ারী খেল দেখছিল আর হাসছিল। হজরত রহিমশা বলেছিলেন—তখন আপনার তাঁবুতে এই কালাশের সে দারু পিয়ে একেবারে বেহোঁশ মুর্দার মত পড়ে ছিল।

লতাফৎ খাঁ ঔরৎকে নিয়ে দিল্লগী করতে করতে তাঁবুর বাইরে হল্লা শুনে চমকে উঠেছিল। চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে? ক্যা হুয়া রে? মামলা ক্যা রে?

উত্তর কেউ দেয়নি। কিন্তু তাঁবুর পর্দা ঠেলে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মিরজা নজফ দাঁড়িয়ে বলেছিল—মামলা আমি এনেছি রে খোজা! কি বলছিস তুই? মিরজা নজফ খাঁ মর্দানা নয়?

লতাফৎ খাঁর চোখ ছুটো এমনি বড গোল হয়ে উঠেছিল, শরাবের নেশায় সে চোখ রাঙা দেখাচ্ছিল আর একটা কোন জন্তু-জানোয়ারের মত ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। সেও অর্ধ উলঙ্গ হয়েই বসে ছিল; একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে সে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এ ঔরৎ বাবুজী শয়তানী ঔরৎ। এদের ভয়ডর থাকে না, শরম ইজ্জতের পরওয়া করে না; রাত্রে এরা আগুনের খাপরা মাথায় করে কবরখানার চারিপাশে নাঙ্গা হয়ে নেচে বেড়ায়। খিলখিল করে হেসে সারা হয়। পরভীন সেই আধানাঙ্গা হয়ে শরাবের গেলাস হাতে নিয়ে মিরজা নজফের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল।

লতাফৎ খাঁ যেতে যেতেও হেঁকেছিল—এ-পরভীন!

পরভীন খানিকটা থুতু ফেলে বসেছিল—ভাগ্ কুত্তা কাঁহাকা! ময় নেহি যাউঙ্গী!

বলেই সে এগিয়ে এসে মীর নজফ খাঁ সাহেবকে কুর্নিশ করে বলেছিল—বাঁদীর তশরীফ পঁহুছে জনাব আলি খুদাবন্দ।

বাবুজী, নজফ খাঁ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। সে খুব রাগ করেই ওই ঔরৎকে ছিনিয়ে আনতেই গিয়েছিল—আরও ইচ্ছে ছিল লতাফৎ খাঁকে কিছু শিক্ষা দেয়। কিন্তু লতাফৎ খাঁ হামাগুড়ি দিয়ে সত্যিসত্যিই কুত্তার মতই পালিয়েছিল। তাকে ছুটে গিয়ে ধরে লাঞ্ছনা করতে আর ইচ্ছে হয়নি মীর নজফ খাঁর। এদিকে ওই মদের গেলাস হাতে আধানাঙ্গা আশ্চর্য রূপসী ওই কাশ্মীরী মেয়েটি এগিয়ে এসে তাকে কুর্নিশ করতেই সে আর থাকতে পারেনি, তখন শয়তান তার নিশ্বাসের হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বুকে ঢুকতে

আরম্ভ করেছে ; নজফ খাঁ তখন ওই ঔরতের গায়ের আতরের খুসবু পাচ্ছে—মাথার চুলের তেলের মসলায় গন্ধ পাচ্ছে—তার সঙ্গে পাচ্ছে তার হাতে ধরা গেলাসের শরাবের গন্ধ। নজফ খাঁ ওই ঔরৎকে দু হাতে চেপে ধরে বলেছিল—তোমাকে আমি লুঠে নিলাম। ময় তুঝে লুঠ লিয়া।

শরাবের গ্লাসটা ফেলে দিয়ে দু হাত বাড়িয়ে নজফ খানের গলা জড়িয়ে ধরে বারবার তার ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট রেখে বলেছিল—আমাকে তুমি লুঠে নাও। লো মুঝে লুঠ লো!

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—নিজেকে লুটিয়ে দিতেই তো চাই জনাবআলি! তুমিই তো মুখ ফিরিয়ে চলে গিছলে। আমি তো তোমার।

শয়তান জিতে গেল বাবুজী। কালাশের ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল নিজের তাঁবুতে। শরাবের গেলাস আর বোতল টেনে নিয়ে বসেছিল। বহুৎ মজাদার খোয়াব দেখেছে সে।

(তের)

হজরত রহিমশাহের কথা কখনও তো মিথ্যা নয় বাবুজী। আগেই তাঁর কথা বলেছি তুমি শুনেছ। সব সময়েই ভাল আর মন্দ সাচ্চা আর ঝুটা শয়তানি আর ইনসানিয়াতির মধ্যে লড়াই চলে। চলছেই। খুদা বসে বসে দেখেন। পয়গম্বর রসুলের হুকুমৎ যতক্ষণ মানে মানুষ ততক্ষণ ইনসানিয়াতির জিত। এক একটা কালে ইনসানেরা পয়গম্বর রসুলকে মানতে চায় না; তখন শয়তান সুবিধে পায়, তখন সেই হয়ে বসতে চায় মানুষের মালিক দুনিয়ায় মালিক। শয়তান একটা কৌশল জানে বাবুজী—আচ্ছা কৌশল। সে মানুষের

কাছে এসে বলে—তুমি মালিক তুমি সব—আমি তোমার গোলাম তোমার বান্দা। আমি তোমাকে হুকুম করি না তোমাকে শলাহ দি।

ওতেই মানুষের সর্বনাশ হয়। সে তখন সব বরবাদ করে দেয়। খোদাকে পর্যন্ত।

ওই যে মীর নজফ খাঁ যে চল্লিশ বছর বয়স হতে হতে হিন্দুস্তানের বাদশার মীরবক্সী হয়ে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল সে মানুষটাকে শয়তান-ভরকরা এই ঔরৎ দু বছরের মধ্যে একদম দানা কি ফলের শুকনো খোসা করে ছেড়ে দিলে বাবুজী। ওই শয়তান-ভরকরা পরভীন তার ভিতরে পোকার মত ঢুকে কুরে কুরে সব শাঁসটুকু খেয়ে তাকে শুকনো খোসা করে ছেড়ে দিলে।

দু বছরের মধ্যে নজফ খাঁ একদম দেউলিয়া হয়ে গেল নিজে—দেউলিয়া করে দিলে বাদশাহীকে। দিল্লীর বাদশাহের সিপাহীরা তনব না পেয়ে চিৎকার করতে লাগল; বাদশাহের হারেমে শাহজাদা শাহজাদীদের বান্দা বান্দীদের পর্যন্ত পুরা বাদশাহী খানার খরচা মিলল না। শাহজাদী বেগমসাহেবাদের তনখা' বাকী পড়ল। হারেম থেকে বাদশাহের কাছে দরখাস্ত এল কি যমুনার ঘাটের দরওয়াজা খুলে দিতে হুকুম হোক। আমরা জানানারা সকলে এক-সঙ্গে যমুনার জলে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে ডুবে মরব। শয়তান হাসতে লাগল বাবুসাহেব।

* * *

দু বছরে নজফ খাঁ এসেছে জহান্নমের কিনারায়।

হাতে ধরে টেনে এনেছে ওই ঔরৎ। ওই কাশ্মীরী মেয়ে পরভীন। এই দু বছরে মিরজা নজফের দুশমন উজীর আবদুল আহাদ খতম্ হয়েছে। নজফ খাঁ সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে বাদশাহী দরবারে কিন্তু বাদশাহী খাজাঞ্চীখানা ফতুর হয়ে গেছে, বাদশাহের হারেমের খরচা

চলে না। মিরজা নজফ নিজে জহান্নমে গেছে—ব্যাধিতে সে জীর্ণ হয়ে গেছে।

সকালবেলা থেকে শরাব আর শরাব। গান নাচ আর গান। পরভীন বসে থাকে পাশে, সামনে কেনা বাঁদীরা নাচে আর গায়। গায় আর নাচে। বাড়িতে মজলিস হয়, বাগিচায় মজলিস হয়, বজরায় মজলিস বসে। যমুনার কিনারায় বালির চড়ার উপর আসর বসে। লতাফৎ খাঁ এখন চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী নজফ খানের। লতাফৎ খাঁ আর আবদুল আহাদের আদমী নয়। আবদুল আহাদকে নজফ খাঁ আটক রেখেছে কেল্লার মধ্যে। নজফ খাঁই এখন উজীর মীরবক্সী সব। সর্বেসর্বা। লতাফৎ খাঁও এখন নজফ খানের লোক। সেদিন এই বেশরমী খোজা আধানাঙ্গা অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাঁবু থেকে। তারপর সেই এসে নজফ খাঁয়ের পায়ে গড়িয়ে পড়েছিল নজফ খাঁয়ের কাছে।

পরভীন বলেছিল—ওকে মাফ করে নিজের কুত্তা করে নাও গো মেরে পেয়ার! কুত্তা তোমার অনেক কাম দেবে। উজীর আহাদ খাঁকে খতম করতে ওই কুত্তার চেয়ে বেশী কাম তোমাকে কেউ দেবে না।

তা ছাড়া আরও কাজে এসেছিল লতাফৎ খাঁ। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে নজফ খাঁয়ের একটা মিটমাট করে দিয়ে গোটা রোহিলখণ্ড সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করেছিল।

* * *

চব্বিশ ঘণ্টাব সঙ্গী হয়েছিল লতাফৎ খাঁ।

খানাপিনা দারু ঔরৎ এর বেবাক বন্দোবস্ত করত সে আর নজফ খাঁয়ের পাশে বসে খেত। গোগ্রাসে গিলত।

যমুনার কিনারায় তরমুজ খরমুজের ক্ষেতির পাশে নাচ-গানের আসর পড়ত। নাচগান হতে হতে হঠাৎ নাচগান থামত;

বাঁদীরা নাচনেবালীরা পাঁয়জের বাজিয়ে কাঁকন বাজিয়ে খিলখিল হাসির তুফান তুলে ছুটে গিয়ে পড়ত সেই ক্ষেতিতে—সেখান থেকে তরমুজ খরমুজ নিয়ে এসে জমা করে দিতে নজফ খাঁয়ের সামনে। নজফ খাঁ খুশী হয়ে পরভীনকে বলত—তুমি খুশী ?

সে বলত—বহুৎ খুব।

সারা দিল্লীর হালও এমনি। কাফিখানায় কাফিখানায় মস্তান আর গুণ্ডাদের আড্ডা—খিস্তি আর খেউড়ের তুফান—দারুখানায় শরাবের দরিয়া বইছে। কসবীপাড়ায় চোদ্দ পনের বছরের ছোকরা থেকে জোওয়ান থেকে আশী বছরের বুঢ্‌ঢা পর্যন্ত ভিড় জমাচ্ছে। লালকিল্লায় আফিংখোর শাহ আলম ঝিমচ্ছে আর তসবীমালা জপছে, আর গাল পাড়ছে নজফ খাঁকে। মধ্যে মধ্যে এক এক বার ঘুরে ফিরে দেখে আসছে মাটির নীচে তার পুঁতে রাখা দৌলত ঠিক আছে কি না।

দৌলতের লোভে বাদশাহ শকুনের মত হয়ে গিয়েছিল বাবুজী। হজরত রহিমশা বলতেন—বাংগাল মুল্ক থেকে ফিরিঙ্গী কোম্পানির ক্লাইভ সাহেবকে দেওয়ানীর ফরমান দিয়ে কম দৌলত আনেনি বাদশাহ। তা ছাড়া এই পাথলগড় ঘাউসগড় দু দুবার লুটে নাজিবউদ্দৌলার দৌলত সেও অনেক। সে সব সে মাটির নীচে গেড়ে রেখেছিল। তার এক দামড়ী কি এক সিক্কা কখনও বের করত না।

বাবুজী, দিল্লীর কেল্লার মধ্যে আটকখানায় যত শাহজাদা শাহজাদী বেওয়া বেগম তারা তনখা দূরে থাক দুবেলা পোড়া রুটি পর্যন্ত পেত না ; তারা চিড়িয়াখানায় ভুখার তাড়ায় জানবারেরা যেমন করে চেঁচায় তেমনি করে চেঁচাত।

বাদশাহ গাল দিত নজফ খাঁকে। হররোজ বলত—আজ যদি কেউ খানাপিনা করে তো সে হারামখোর। যাও—সব লোক

মিলে যাও। ধরনা লাগাও ওই নজফ খাঁয়ের হাবেলীতে। শয়তান দুনিয়াকে হিন্দুস্তানকে জহান্নমে দেবার হুকুম জারি করেছে। শয়তানের পিয়াদা ওই নজফ খাঁ। হিন্দুস্তানকে ওই দেবে জহান্নমে।

কখনও কখনও পাগলের মত চিৎকার করে বলত—এয় খুদা মেহেরবান আমার জান খত্‌ম্‌ করে দাও! জিন্দগী শেষ করো। এ আর সইতে পারছি না। কবরের মাটির সঙ্গে আমাকে মিশিয়ে দাও।

এরই মধ্যে বাদশাহের মনে শান্তি মিলত—সান্ত্বনা পেত এক বুড়া হিন্দু ফকীর আর তার এক মুরিদা লেড়কীর গানে।

পথে যারা খুদার নাম করে ভিখ মেঙে মেঙে বেড়ায় তাদেরই দুজন।

এ মেয়ে হল সেই শক্করবাঈ বাবুসাহেব।

*　　*　　*

'শক্করবাঈ মানে গুলবদ্‌নী, সেই নটী গন্ধর্বীর বেটী? বাম্‌ন-ওলী গাঁওয়ের যে বেটীকে সেদিন—'

কথাটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম। শক্করবাঈকে যেন ভুলে গিছলাম। ওই পরভীন মেয়েটা এসে শক্করকে যেন নিজের ছায়ার অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিল। কিংবা লাল মশালের কালির এবং ধোঁয়ার পুঞ্জ বিকীর্ণ করা আলোর মধ্যে একটি ঘিয়ের প্রদীপের শান্ত শুভ্র শিখাটির মত দৃষ্টির বাইরে চলে গিছল।

ফকীর বললেন—হাঁ বাবুজী। এ সেই গুলবদ্‌নী। সেই মোমের বাতির আলোর মত গুলবদ্‌নী—সে আলো দেয় আর সেই আলোর তাপে নিজে গলে গলে পড়ে; যা তৈরী হয় বাবুজী ফুলের মধু রাখবার জন্যে যে মৌচাক তার থেকে। এ সেই মেয়ে।

তার কথা এবার বলি বাবুজী।

সেই যেদিন দিল্লী থেকে পালাবার পথে গোলাম কাদের এই ফুলের মত লেড়কীকে বাগিচার মধ্যে অন্ধকার রাত্রে দাঁতে ছিঁড়ে চিবিয়ে হাতে দলে পিষে বুকে ছুরি বসাতে গিয়ে খানিকটা পাশে ছুরি বসিয়ে চলে গেল, তার এক বছর পরে তাদের গাঁও বামনওলীতে এল ছত্রী সর্দার চান্দ সিং আর তার স্ত্রী আর বিধবা পুত্রবধূ আর নাতি মনিয়ার সিং। মনিয়ার সিংয়ের বাপ গণপৎ সিংয়ের বেটাই হল গুলবদনীর বাপ!

বাবুসাহেব, ঘাউসগড় পড়ল। গোলাম কাদের আর জবিতা খাঁয়ের বেগমেরা বেটীরা এক ওই শয়তানী পরভীন ছাড়া সব বন্দী হল। তারপর মিটমাট হল নজফ খাঁয়ের সঙ্গে জবিতা খাঁয়ের। জবিতা খাঁ এল—হাতে রুমাল বেঁধে বাদশাহের কাছে হাজির হয়ে মাথা হেঁট করে খাড়া রইল; বাদশা তাকে মাফ করলেন, খেলাত দিলেন।

ছাড়া পেলে গোলাম কাদের। কিন্তু সে এল না জবিতা খাঁয়ের কাছে। জবিতা খাঁ শিখ হয়েছিল—তার ধরম গিয়েছে জাত গিয়েছে; রোহিলখণ্ডের নবাবী গদি ইসলামের খাদিম নবাব নাজিবউদ্দৌলার গদি; কাফের আর শিয়াদের দাবিয়ে শাসন করে আফগানশাহী এই গদি—এ গদিতে যে ইসলাম ছেড়ে শিখ হয়ে ধরম সিং নাম নিয়েছিল—লা ইলাহা ইল্লালার বদলে অলখ্ নরঞ্জন বলে ডেকেছিল তার কোন একতিয়ার নাই। দুসরা দফে কলেমা পড়লেও নেই।

বাবুজী, আরও একটা কারণ ছিল।

জবিতা খাঁয়ের এক বেটীকে সাদীও করেছিল নজফ খাঁ। গোলাম কাদের সন্দেহ করেছিল কি জবিতা খাঁ গুজর গেলে পর নবাবী যাবে

নজফ খাঁয়ের শালার হাতে কি খুদ নজফ খাঁ এসে জেঁকে বসবে রোহিলখণ্ডের মসনদে।

পরভীন বেগম কালাশেরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল—ভয় করো না নবাবজাদা; খতম করো তুমি জবিতা খাঁকে; নজফ খাঁয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত থেকো; পরভীন আছে এখানে। পরভীন জাদু জানে। সে তাকে সামলে রাখবে। তুমি নবাব জবিতা খাঁয়ের হিসাব চুকাও। ভয় আমার তাকে। পরভীনকে পেলে সে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে। তুমি আমাকে পাঠিয়েছ নজফ খাঁয়ের কাছে।

গোলাম কাদের তখন সবে নওজওয়ানী পেয়েছে।

বয়স তখন আঠারো পার হয়েছে। সাহারানপুর নাজিবাবাদের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে তরাইয়ের জঙ্গলে সে আড্ডা গাড়লে।

নটী গন্ধর্বীদের বেটী জন্ম থেকেই কিছু বে-শরমী হয় বাবুজী। হয়তো বা ওদের রক্তেই থাকে।

শক্করবাঈ গুলবদনী বাপের সম্পর্ক ধরে মনিয়ার সিংকে বলেছিল দাদাজী।

মনিয়ারের ভাল লেগেছিল তার এই গন্ধর্বী বহেনকে। সেকালের ছত্রীদের সমাজ—সে সমাজে গন্ধর্বী বা নটী পিয়ারীর জন্যে যেমন কোন লজ্জা ছিল না তেমনি বাড়িঘরের আত্মীয়স্বজনেও এতে দোষের কিছু দেখত না। সম্পত্তি কিছু থাকলেই তার সঙ্গে নানান আসবাবের মত উপপত্নীও একরকম আসবাব ছিল। দাসী বাঁদী কেনারও রেওয়াজ ছিল। মনিয়ারের বাপের আরও কেনা বাঁদী ছিল—তাদেরও চার ছেলে আছে। তারা সব লোক ভাল নয়। তারা চলে গেছে পাঞ্জাবের দিকে। শিখ হয়েছে দুজন। শিখ সর্দারদের নোকরি নিয়েছে। দুজনের একজন ডাকাতি করে ফেরে। একজন চলে গিয়েছে তরাইয়ের দিকে—হাফিজ রহমৎ খাঁ সাহেবের

নোকরি করে। তার মা ছিল মুসলমানী। সে মুসলমান। তাদের ভারী রাগ এই মনিয়ারের উপর।

ফকীরসাহেব বললেন—হবেই বাবুজী। মনিয়ার সিং সাদীকরা তিন বউয়ের এক লেড়কা। বাকী দুই বউয়ের একজনের আছে লেড়কী—সে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। তারও মনিয়ারের উপর ভারী রাগ। একজনের ছেলেপুলে হয়নি। সে মনিয়ারের বাপের সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরেছে। সতী হয়েছে। সে খুব সুন্দরী ছিল। মনিয়ার তার জীবনে তার একটি ভাই বা বহেন পায়নি যাকে সে ভালবাসতে পারে; সে তাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে। এখানে এই বামনওলীতে এসে ওই শক্করকে বহেন পেয়ে সে বর্তে গিয়েছিল।

শক্কর তখন নওজওয়ানী হয়ে উঠেছে। মনিয়ারও নওজওয়ান। পরিচয়-না-থাকা ভাই বহেন। সে পরিচয় প্রায় একদিনেই পুরনো হয়ে গেল—জানপহছান ছিল না একথা মনেই হল না।

ছুটো নদী বাবুজী, যতদিন পৃথক থাকে ততদিন এর জলের ওর জলের রঙে ফারক থাকে স্বাদেও ফারক থাকে কিন্তু দুই নদীতে মিশে গেলে রঙে স্বাদে মিশে একাকার হয়ে যায় তখন আর আলাদা করা যায় না ঠিক তাই হল—

শক্কর জেনে নিলে তারা দাদাজীর কোন পিয়ারী আছে কি না? তার দাদো তাকে ক'টা বাঁদী কিনে দিয়েছিল, তাদের উমর কত ছিল, দেখতে কেমন ছিল? তারা গীত গায় কেমন? তারা বীন কি সেতার বাজাতে পারে কি না? এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বলে ফেললে এই নটীর মেয়ে—দাদাজী, আমি নটীর মেয়ে—মা নটী, বাবা রাজপুত। নটীর ধরমে বলে গন্ধর্বমতে সাদী হতে হয় একজনের সঙ্গে। সারাজীবনে সে নটী যেখানে থাক যাই তার পেশা হোক—সে নাচওয়ালী পেশাই হোক আর কোন রাজা বাদশাহের হারেমে তার পিয়ারীগিরিই হোক আসলে সে সেই গন্ধর্বমতে বিয়ে করা

লোকেরই স্ত্রী। সেখানেও হিন্দু মুসলমান জাতবিচার নাই। মহম্মদশাহ বাদশাহের নটী বেগম ছিল উধমবাঈ, তার বেটা আহম্মদশা বাদশা হয়েছিল। দাদাজী! তাহলে আমার জীবনে কি হবে বল?

মনিয়ার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হাঁ তা কি হয়েছে?

—বুঝতে পার না?

—না।

—দাদাজী, বেটাছেলেদের এদিকে থোড়াথুড়ি বুদ্ধি মোটা হয়। ঔরৎ না হলে ঔরতের এ ধাঁধার উত্তর দিতে পারে না। আমার ইজ্জত জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিয়েছে নবাবজাদা গোলাম কাদের!

—হাঁ। আপসোসের কথা শক্কর আমরা সেই নবাবজাদাদের নোকর তাঁবেদার। তাদের দেওয়া জমিন ক্ষেতখামার পাঁচ পাঁচ গাঁওয়ের জমিদারি জায়গীরদের মত ভোগ করি। কি করে শোধ নেব তাই ভাবছি। তুমি আমার বহেন এ কথা তো ভুলতে পারব না আমি!

শক্কর বলেছিল—দাদাজী, রাক্ষস বিবাহ মতে নবাবজাদা জবর-বস্তিতে আমার ইজ্জৎ নিয়ে আমার স্বামী হয়ে গিয়েছে। যায়নি? তুমি বল?

অনেক ভেবে মনিয়ার সিং বলেছিল—এর জবাব আমি তো দিতে পারব না শক্কর। এ জিজ্ঞাসা করতে হবে পণ্ডিতজী লোককে। তোমাদের গাঁওয়ের পুরোহিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে দাদোকে।

—সে তুমি জিজ্ঞাসা করো।

জিজ্ঞাসা করেছিল মনিয়ার। কিন্তু পুরোহিত মহারাজ আর দাদোর সঙ্গে মতভেদ ঘটেছিল। এর মাঝখানে এসে পড়েছিল

বুড়ী দিদিয়া। সে এসে এককথায় মীমাংসা করে দিয়েছিল। বলেছিল—তোমরা দুজনেই কিছু জান না। তোমাদের কারুর মত চলবে না। লেড়কীকে তোমরা জিজ্ঞাসা করলে না তোমার ইজ্জতের সঙ্গে তোমার দিলও কি সে জবরদস্তি করে কেড়ে নিতে পেরেছে কি না। তা যদি পেরে থাকে তা হলে? তা হলে কি হবে?

মহারাজ বলেছিল—কিন্তু শাস্ত্রে পুরাণে তা এমন কথা লিখা নাই।

—হায় হায় হায় শাস্তর তোমার মহারাজ। রাজা রাবণ তিন ভুবনকে লেড়কী জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এল, জবরদস্তিতেই তার সঙ্গে সাদী হয়ে গেল। তারা লঙ্কার সোনার পুরীর মহলে মহলে দিব্যি সুখে থেকেছে। এক সীতামাঈয়ের ইজ্জৎ রক্‌সা করলেন দেওলোক। আর সীতামাঈয়ের দিল ভুলল না রাবণ রাজার বিশ বিশ হাত দশ দশ মুণ্ডু সোনার পুরী দেখে তাই তিনি বাঁচলেন। তিনি বাঁচলেন রাবণ মরল। শাস্তর তুমি কিছু জান না মহরাজ!

চান্দ সিং কিছু বলতে গিয়েছিল কিন্তু বুড়ী তাকে কিছু বলতেই দেয়নি। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—বুড়োয়া, ধরম রাখবি কি রাজপুত ইজ্জৎ রাখবি তো তোর এই বেটার গন্ধর্বী জরুর পেটের লেড়কীকে পৌঁছে দিয়ে আয় গোলাম কাদের নবাবজাদার ঘরে। বেটীটা ইজ্জতের সঙ্গে তাকে দিলও দিয়ে দিয়েছে। মহারাজা মানসিংহের ফুফি গিয়েছিল আকবরশাহের অন্দর—বহেনের সঙ্গে সাদী হয়েছিল জাহাঙ্গীর বাদশার। কোন্ বাদশাহের রাজপুত বেগম কি পরস্তার নেই! এ তো তোর বেটার নটী পিয়ারীর বেটী। তোর জাত ও মেয়েকে তোরা দিসনি। ওরা সেই নটীই থাকল।

কিন্তু তোদেরই রক্ত তো ওদের শরীরে! যা পৌঁছে দে ওকে তার কাছে যে ওর কুমারীত্ব নিয়েছে।

(চৌদ্দ)

বাবুজী, গোলাম কাদের নবাবজাদা আগ্রা কেল্লা থেকে খালাস পেয়ে ঘাউসগড় এল না—সে চলে গেল তরাই জঙ্গলে—তার বাপের সঙ্গে লাগল ঝগড়া। যে বাপ মুসলমান হয়ে ইসলাম ছেড়ে শিখ হয়েছিল তাকে সে মানবে না। তাকে বাপ বলবে না। সে নিজেই বললে—সেই হল নাজিবউদ্দৌলার ওয়ারিস। জবিতা খাঁ নয়।

চান্দ আর মনিয়ার খাঁ গেল গোলাম কাদেরের কাছে—চান্দের বুড়ী স্ত্রী আর মুনিয়ারের বিধবা মা রইল বাম্‌নওলীতে। রইল শক্করের মা চান্দের বেটার নটী পিয়ারীদের কাছে। তারা তাদের দেওতার মত যতন করে রাখলে। কিন্তু খোদার কি মর্জি তা তো মানুষ বোঝে না।

বাবুজী, হয় খুদাতায়লার মর্জি নয়তো শয়তানের শয়তানি—একদিন ধর্‌তি কাঁপল। খুব জোর কাঁপল বাবুজী।

বাদশা শাহ আলম বলেছিল—এ শয়তানের চক্রান্ত। তাবারিখ ইতিহাস পড়ে দেখো বাবুজী। এগারশো আটান্ন উনষাট হিজরাতে শয়তানের চক্রান্তে হিন্দুস্তানের আর বাদশাহের দুর্ভাগ্যের আর শেষ ছিল না। বাদশা শা আলম অনেক জলুস করে অনেক ধুম করে বেটা শাহজাদা আকবরের সাদী দিলে—তার জন্যে চার পাঁচ মাস যোগাড়যন্তর করেছিল। বাবুজী, সাদী হয়ে গেল যেদিন, তার ঠিক চার দিন বাদ শাহজাদা ফারকান্দভক্ত মিরজা জাহান গুজর গেল।

কি সে বেমারি এর হদিস কোন হাকিম ঠিক করতেই পারলে না; সারাদিন ভুগে সন্ধ্যেবেলা শাহজাদা মারা গেল; আর সেই রাতেই আরও মারা গেল মিরজা জাহানের এক বাচ্চা লেড়কী। ওই একই বেমারি বাবুসাহেব। তার এক মাস পর দিল্লী শহর তার আশপাশ—বলতে গেলে আধা পাঞ্জাব রোহিলখণ্ড জুড়ে বয়ে গেল এক আঁধির তুফান। আঁধি নিশ্চয় জান বাবুজী—ধুলো আর ঝড় একসঙ্গে; পশ্চিম উত্তর দিক থেকে আসমান জমিন সব কিছু ধুলোর একটা ঝাপটায় ঢেকে দিয়ে বয়ে যায়। থাকে আধাঘড়ি, তারপর দু চার ফোঁটা পানি—বাস্। ওতেই ঠাণ্ডা পড়ে যায়। ঝড় থামে। কিন্তু সেবারের ঝড়ের মত ঝড় এর আগেও কেউ দেখে নাই; হজরত রহিমশা তাই বলেছিলেন। তার পরেও আজ অবধি এমন আঁধি হয় নাই।

পাঞ্জাব রোহিলখণ্ড মুল্কে বড় বড় গাছ তামাম উপড়ে পড়েছিল। গাঁওগাঁওলার খাপরার চাল বিলকুল উড়ে গিয়েছিল; বড় পাকা ইমারত হাবেলী মঞ্জিল কেল্লা এ সবও রেহাই পায়নি—কোথাও মিনার ভেঙেছিল কোথাও পাঁচিল, ভেঙেছিল শহর বাজারের—খাস দিল্লী আগ্রার বড় বড় মোকাম সুদ্ধ সে আঁধির ধাক্কায় ভেঙে পড়েছিল। মাঠে পথে যে সব মানুষজন ছিল তাদের উড়িয়ে আসমানে তুলে গাছের ডালে ধাক্কা লাগিয়ে গেঁথে দিয়েছিল। ঘরে মাটিতে জমিনের উপর মানুষ তুলে যেন আছাড় মেরে ছেঁচে দিয়েছিল। হাতী উট ঘোড়া বড় বড় জানোয়ার পর্যন্ত মরেছিল বাবুজী—গাছ চাপা পড়ে, অন্ধকারে পাগলার মত ছুটে গিয়ে কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মরেছিল। দরিয়ার পানি যমুনার জল লালকেল্লার উল্টো পাড়ে ঝড়ের ধাক্কায় উপছে উঠে বেবাক বস্তি দেহাত সব ভাসিয়ে দিয়েছিল।

তারপর বাবুজী, ক'মাস পরই একদিন হল ভূমিকম্প ; ধর্‌তিমাঈ কাঁপল। শীতের কালের সময়, মানুষজন ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে, হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ উঠল। যেন ধর্‌তিমাঈয়া কলেজার যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল। সে গোঙানি তোমরা বিহারের ভূমিকম্পের সময় শুনে থাকবে। তারপরই থরথর করে কাঁপতে লাগল ধর্‌তি। ঘরবাড়ি পড়তে লাগল তাসের ঘরের মত। মাটি চড়চড় করে ফাটল—সেই ফাটল দিয়ে গরম পানি উঠল ; দরিয়ার পানি বিলকুল মাটির তলায় চলে গেল ; তামাম হিন্দুস্তান জুড়ে একটা কান্না উঠল, ঠিক বাচ্চা ছেলেতে যেমন দুরন্ত ভয় পেলে পুকার দিয়ে কেঁদে ওঠে তেমনি কান্না।

যখন থামল কম্পন তখম খতম হয়ে গেছে আধা মুল্ক। বাড়ি ঘর ভেঙে পড়েছে—বড় বড় ইমারত কোনটা আছাড় খেয়ে পড়েছে কোনটা আধখানা পড়েছে কোনটা ফেটেছে চৌচির হয়ে ; কোন কোনটা দু'ভাগ হয়ে ফেটে গিয়ে পড়তে পড়তে সামলেছে—আবার এসে জুড়ে গেছে, আছে শুধু ফাটলের দাগ—এমনও হয়েছে। কত মানুষ যে মরেছিল তার হিসাব কেউ করতে পারেনি। মানুষদের সৎকার হয়নি। কবরও না পোড়ানোও না। যে ভাঙা ঘরের তলায় চাপা পড়েছিল সেইখানেই চাপা পড়ে রইল, পচল, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

বাবুসাহেব, গোটা বাম্‌নওলী গাঁওটাই একরকম ভেঙে মাটি আর খাপরার ঢিপি হয়ে গেল। নটীপাড়াটা একেবারে শেষ। অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরটার চূড়া ভাঙল—মন্দিরটা ফাটল—সামনের কুয়োটা আশ্চর্যভাবে ভিতর থেকে বালু আর কাদা উঠে ভর্তি হয়ে গেল। উপরের চত্বরের কোন চিহ্ন রইল না।

পুব পাড়ায় নটী ছাড়া অন্য জাতেরা দু চার দশ বিশ জন বাঁচল এই পর্যন্ত। বাবুজী, নটীপাড়ায় বাঁচল শুধু গুলবদনী।

শক্করবাঈ। কি করে বাঁচল কেন বাঁচল তা কেউ বলতে পারবে না।

হজরত রহিমশাহ তখন হজ্জে গিয়েছিলেন। তিনি এখানে ছিলেন না। হজ থেকে ফিরে এসেও গুলবদ্‌নীর কোন পাত্তা পাননি। পরে পাত্তা যখন পেয়েছিলেন তখন আসমানের দিকে হাত তুলে বলতেন—কি করে বাঁচল লেড়কী সে ওই ওপরের মর্জি।

নইলে একই ঘরে শুয়ে ছিল চারজন। চান্দ সর্দারের পঙ্গু স্ত্রী, তার বিধবা পুত্রবধূ মনিয়ারের মা, শক্করের মা আর শক্কর—এই চার-জনের মধ্যে লেড়কী শুধু বাঁচল আর কেউ বাঁচল না।

আর যারা বেঁচেছিল বাবুজী তাদের মধ্যে ছিল ওই অমৃতেশ্বর শিউজীর যে পুরোহিত মহারাজ—সেই। বুড়া মহা-রাজের নসীব—বুড়ার ঘর চাপা পড়ে তার স্ত্রী মরল বেটা মরল বেটার বউ তার ছেলে মেয়ে সব মরে গেল, রইল ওই বুড়া। বুড়া মাথায় চোট খেয়েছিল। কিন্তু সে চোট সে সামলে উঠেও বাঁচল। কিন্তু তার দুটো চোখ প্রায় অন্ধা হয়ে গেল।

ভূমিকম্পের পরের দিন শক্কর কান্নাকাটি করে ছুটে বেড়িয়ে-ছিল আশ্রয়ের জন্যে। কোথায় মিলবে আশ্রয়? শীত সেবার ভীষণ বাবু। পানিতে সকালবেলা জ্বাল দেওয়া দুধের সরের মত ঠাণ্ডা বরফের পাতলা সর জমে। সে পাড়াতেও সেবার কম লোক মরেনি। তাছাড়াও বাবুজী তখন মানুষদের মধ্যে বদমাশ যারা তারা বের হয়েছিল খাবারের জন্যে ভাঙা বাড়িঘর লুঠের জন্যে ঔরতের জন্যে।

গুলবদ্‌নীর সুরত ছিল—সে সুরত নওজোওয়ানীর ছোঁয়াচে তখন নতুন ফুলধরা চামেইলী গাছের মত ঝলমলে হয়ে উঠেছে—খুসবু দিয়ে যেন ভরিয়ে দিয়েছে বাতাবরণ। ভোররেলা হতেই সে

ভাঙা ঘরে চাপাপড়া মা, সর্দার দিদিয়া, সর্দার মাঈ সকলের মৃতদেহ দেখে খানিকটা কান্নাকাটি করে ছুটে এসেছিল ব্রাহ্মণ-পাড়ায় ওই মহারাজজীর সন্ধানে। মহারাজজী ওই কপালের আঘাত নিয়েও বেঁচে গেছেন—বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছিলেন আর ওই ভাঙা অমৃতেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তাকেই গাল দিচ্ছিলেন।

—পাগল—পাগল—তু পাগল! ঝুট বিলকুল ঝুট! এরই মধ্যে শঙ্কর গিয়ে তাকে ডেকেছিল—মহারাজজী!

মহারাজজী তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন—শঙ্কর?

—হাঁ মহারাজ! আমি বেঁচেছি আর সব মরে গেছে মহা-রাজজী! সবাই। কিন্তু তোমার মাথায় যে এ ভারী চোট লেগেছে মহারাজজী!

নিজের দোপাট্টা থেকে ন্যাকড়া ছিঁড়ে তার কপাল বেঁধে দিয়েছিল। আর দুজনে পরামর্শ করে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের মেঝের তলায় মাটির ভিতর গোপন একখানা ঘর ছিল ওই ঘরের মধ্যে। তারপর বাবুজী মহারাজজীর যখন চোট ভাল হল সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল তখন দুজনে পরামর্শ করে বাম্‌নওলীর ভাঙা গাঁও ছেড়ে রওনা হল দিল্লী।

সারা দেশ জুড়ে অরাজক। হিন্দুস্তানে বাদশা থেকে দেহাতের সামান্য চাষী সামান্য মজদুর পর্যন্ত বলছে পয়গম্বরশাহী শেষ হয়ে শয়তানশাহী কায়েম হতে চলেছে। পুরানা জমানার শেষ। এরপর একটা এমন কিছু হবে যাতে সমস্ত মন্দির মসজিদ বিলকুল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

আর একদল বলে—না—মানুষেরা বিশেষ করে হিন্দুস্তানের মানুষেরা পাপে পাপে একেবারে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত হাওয়া পানি মাটি, মানুষের মন দিল মগজ ছয়লাপ করে দিয়েছে,

সেই কারণে খুদাতায়লার রোষ হয়েছে—এবার শয়তানের শয়তানি খতম হবে। মানুষের বুকের মধ্যে শয়তান বাসা গেড়েছে বলে মানুষেরাও তামাম মরবে।

বাদশাহ দরবারে তখন নজফ খাঁয়ের উজীরির শেষ আমল—বাদশাহী খাজাঞ্চীখানায় সোনা রূপা দূরের কথা তামা সীসাও নেই। সুবার মধ্যে বাংলা থেকে ইংরেজরা খাজনা পাঠায়—আর কোন সুবা থেকে দামড়ী আসে না। নজফ খাঁ রোহিলখণ্ড থেকে লতাফৎ খাঁয়ের সঙ্গে দোস্তি করে পরভীনকে নিয়ে শরাব আর নাচগান ঔরৎ নিয়ে নিজে জহান্নমে গেল সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহীকেও দেউলে করে জহান্নমে দেবার ব্যবস্থা করেছে। মারাঠারা আপনাদের চৌথ নিয়ে দিব্যি বসে আছে। বাদশাহী হারেমে চিৎকার উঠছে। বেগমরা শাহজাদীরা বলছে তারা আঁচলে আঁচলে গিঁঠ বেঁধে চুলের বেণীতে বেণীতে বাঁধন দিয়ে যমুনায় ঝাঁপ খাবে—তারা মরবে। এ অভাব তারা সইতে পারছে না। বাচ্চারা পর্যন্ত কাঁদে। শাহজাদারা বাদশাহের মরণ কামনা করে। আটক বাদশাহবংশের ছেলেরা জানওয়ারের মত রুটি! রুটি! রুটি! বলে চিৎকার করে। বাদশাহের বান্দা গোলামের বাঁদীরা পেট পুরে খেতে পায় না। লালকিল্লার লালপণ্টন তলব পায় না। তারা বাদশাহকে গাল দেয়। সারা দিল্লীর বাজারে বানিয়া মহাজনদের কাছে বাদশাহের দেনার আর শেষ নাই। আসল দূরের কথা তারা সুদ পায় না। তারা নতুন ধার দিতে নারাজ। খুদ বাদশাহের দুই পায়জামা এক কামিজ এক কুর্তা সম্বল হয়েছে। দুসরা নেই।

বাদশাহ গাল দিত নজফ খাঁকে, বলত—শয়তান ওই নজফ খাঁ হল খুদ শয়তানের পিয়াদা। সারা হিন্দুস্তানকে জহান্নমে দেবার ব্যবস্থা পাক্কা করছে। শয়তানের পরওয়ানা জারি করতে এসেছে।

যাও তার কাছে—দেখবে কোন বাগিচায় নয়তো যমুনা-

কিনারায় বালুর উপর তাঁবু ফেলে শরাবে চুর হয়ে আওরৎ নিয়ে নাঙ্গা হয়ে পড়ে আছে। দিল্লীর গলিতে গলিতে ফের দেখবে তাড়িখানা কাফিখানা কসবীখানায় মেলা বসে গেছে। পাপ পুরা হয়ে আসছে। বেমার গেছে। আঁধি গেছে। ভূমিকম্প গেছে। এবার শেষ হবে। এবার খত্‌ম্‌। তৈয়ার থাকো! সব তৈয়ার থাকো!

মাথার চুল ছিঁড়ত বাদশা। আর কৌটো থেকে আফিং বের করে মুখে ফেলত। আর ফুরসির নল নিয়ে টানত। সে তামাকে আগের বাদশাহী তরিবৎ ছিল না। শুধু ধোঁয়া একরাশ ধোঁয়া বাদশাহের কলিজাকে ফুসফুসকে ভরে দিত।

এরই মধ্যে বাদশাহের কানে এসে একদিন পৌঁছেছিল গান। পুরুষ আর মেয়ের মেলানো গলায় গান গাইছিল। লালকিল্লার পূর্বদিকে যমুনা নদীর কিনারা বরাবর গান গেয়ে চলেছিল। বাদশাহ শাহ আলম লালকিল্লার বুরুজের উপর থেকে সেই গান শুনতে পেলে। সেদিন তারা গাইছিল দরবেশ দেওয়ানা শয়র মীর তকীর গজল; মীর তকী তখনও বেঁচে।

হালৎ তো ইয়ে হ্যায় মুঝকো ঘমো সে নহি ফরাঘ্‌
দিল সোজিসে দরুনীসে জ্বলতা হ্যায় চু চুরাঘ
সিনা তামাম চাক হৈ সারা জিগর হৈ দাঘ
হৈ নাম মজলি সোঁ মে মরা মীরে বে-দিমাঘ।

বেঁচে থাকার বাস্তব অবস্থা হল দুঃখ; দুঃখ থেকে রেহাই নেই। বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে—জ্বলছে জ্বলন্ত প্রদীপ চেরাঘের মত। সমস্ত বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমি হলাম বে-দেমাক মীর সাহেব। মীর তকী।

শাহ আলম নিজেও কবি ছিল বাবুজী। সেকালে রাজা বাদশাহ এরা রাজা বাদশাহ হয়ে সুখ পেত না, তারা কবি হত। শাহ আলমের গজল আছে, রুবাই আছে। বাদশাহের ভাল

লেগেছিল—"দিল সোজিসে দরুনীসে জ্বলতা হ্যায় চু চুরাঘ। সিনা তামাম চাক হৈ সারা জিগর হৈ দাঘ।" অন্তরের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে; ঠিক জ্বলন্ত প্রদীপের মত নয়, না তা নয়; জ্বলছে তেল দিয়ে ভেজানো বিছানার মত; সারা বুকটা জ্বলে পুড়ে দগদগে ক্ষতে ভরে গেল। ঠিক বলেছে কবি মীর তকী!

বাদশাহ ওই হিন্দু সন্ন্যাসীকে ডেকে আনিয়েছিল। কিল্লার ভিতরে নয়, বাইরে ওই যমুনার কিনারায় এসে তারা দাঁড়িয়েছিল—বাদশাহ বলেছিল—কিছু খুদার নাম শোনাতে পার ফকীর? যে দুখ আর যে জ্বালার কথা বললে তা তো দিনরাত পোড়াচ্ছে। আর কিছু শোনাতে পার?

তারা ভজন শুনিয়েছিল।

বাদশাহ তৃপ্তি পেয়েছিল। কিছু ভিক্ষা দিয়েছিল। আর বলেছিল—উজীর মীরবক্সী নজফ খাঁয়ের কুঠিতে যেতে পার? তাকে শুনিয়ে আসতে পার খুদার নাম? ওই মীর তকীর গজল শুনিয়ে বলতে পার আমরা চোখে দেখে এলাম বাদশা ঠিক এই চেরাঘের মত পুড়ছে—শুধু বাদশা কেন তামাম হিন্দুস্তান পুড়ছে। এ গুনাহ বিলকুল নজফ খাঁ তোমার।

* * *

বাবুজী, বামনগুলীর অন্ধা পুরোহিত আর গুলবদনী বাদশাহের কথা অমান্য করেনি।

তা সেকালে বাদশাহী নোকর ওই সৈয়দভাইয়া গাজিউদ্দিন অযোধ্যার নবাব রোহিলখণ্ডের নাজিবউদ্দৌলা জবিতা খাঁ মারাঠা সরদার রাজপুত রানা শিখ সর্দার ছাড়া হিন্দুস্তানের লোকেরা কখনও করত না। চোরে না ডাকাইতে না চাষীরা না মজদুরে না—কেউ না বাবুজী কেউ না। ভয়ের কথা নয়। ভয় নয়। ভয় করত ঔরংজীব বাদশার আমলে—তারও আগে, তারও পরে কিছুদিন।

কিন্তু তারপর না বাবুজী। তারপর যত তারা দুর্বল হয়ে এসেছে উজীর নাজির সিপাহশালার মনসবদার সুবাদার জায়গীরদার রাজা নবাব সুলতান আমীর ওমরাহেরা যত বে-খাতির করেছে তত তাদের ভালবেসেছে হিন্দুস্তানের লোকে।

তোমাদের রামায়ণে আছে লছমনজী সীতামাঈয়ের পায়ের পাঁয়জের ছাড়া আর কোন গহনা চিনতে পারেন নি। তার মানে এই হয় বাবুজী, যে পায়ের দিক ছাড়া আর কোন দিকে চেয়ে দেখেননি লছমনজী। হিন্দুস্তানে সাধারণ মানুষে বাদশাহী জেনানাদের দিকে ঠিক তেমনি করেই তাকাত। মুখের দিকে চাইত না, কখনও চোখ তুলে চেয়ে দেখত না।

মহারাজজী আর গুলবদনী তারাও বাদশাহের হুকুম তামিল করতে এসেছিল। কিন্তু মীর নজফ খাঁ সাহেবের দেখা মিলল না। নজফ খাঁ তখন শয়তানী মজলিসের মধ্যে মশগুল হয়ে বসে আছে না-হয় বেহোঁশ হয়ে পড়ে আছে না-হয় কোন আওরৎকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে না-হয় খানা খাচ্ছে গোগ্রাসে দারু পান করছে—শরাবের গেলাস মুখে তুলে দিচ্ছে পরভীন। পরভীন তার পাশে বসে থাকত বাবুজী শরাবের গেলাস হাতে; এক পালঙ্কে তার পাশে শুয়ে থাকত, আবার দুসরা ঔরৎকে এনে ওই পালঙ্কে তার পাশে শুইয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে। বাইরে থাকত লতাফৎ খাঁ—কখনও কখনও হঠাৎ এসে হাজির হত কালাশের; তাদের সঙ্গে তার মজলিস বসত। কখনও কদাচিৎ সে চলে যেত মালকিনইজমানির মঞ্জেলে। তারাই তাকে পেয়েছিল বেটী হজরত-মহলের কাছে—আবার তারাই তাকে দিয়েছিল জবিতা খাঁকে। দিল্লীর মসনদে বসাতে হবে আহম্মদশাহের ছেলে শাহজাদা বাঁকাকে, বাবুজী তবারিখের কেতাবে তার ভাল নাম হল শাহজাদা বিদরভক্ত। মালকিনইজমানির বড় রাগ আজিজুদ্দিন আলমগীরের

ছেলের উপর। আজিজুদ্দিনের জন্যে মহম্মদশাহের বংশের বাদশাহী গিয়েছে। মালকিনইজমানি সাহেবাইমহল অনেক লাঞ্ছনার মধ্যে লালকেল্লা ছেড়ে এসেছে। তাদের দৌলত এখনও মাটির নীচে পোতা আছে। পরভীনবানু—এই কাশ্মীরী ঔরৎ, বাবুজী, সেই সব ঔরতের ঔরৎ যারা ঠিক সেই সব পুরুষদের মত ব্যভিচারী—যাদের ভুখা দুনিয়ার সব ঔরতের উপর। মালকিনইজমানির কাছে যখন ছিল তখন পরভীনের বয়স সবে ষোল—বিদরভক্ত তার থেকে কিছু বড়। তখনই সে শাহজাদা বাঁকার প্রেয়সী হতে চেয়েছিল—সেদিকে হাত বাড়িয়েছিল। আজও তার আশা যদি শাহজাদা বিদরভক্ত কোন দিন মসনদে বসে তবে পরভীন তার বেগম হয়ে বসে হিন্দুস্তানের মালকিন হতে পারবে।

শাহজাদা বিদরভক্ত পুরুষ হিসেবে তার মত মেয়ের কাম্য ঠিক নয়। দুব্‌লা দুব্‌লা চেহারা একেবারে মাখনের মত নরম। গুলাবের পাঁপড়ির মত চামড়া। আর পড়ে শুধু কেতাব।

সেদিক দিয়ে ওর যোগ্য মর্দানা জঙ্গী জওয়ান গোলাম কাদের নবাবজাদা। এই ছাতি লাল্‌চে পাথর কেটে গড়া মূর্তির মত শক্ত, এই মাথায় উঁচু জবরদস্ত দেওদার গাছের মত সিধা! সে তার থেকে বয়সে ছোট—চার পাঁচ বছরের ছোটই হবে। নবাব জবিতা খাঁয়ের পরস্তার হওয়ার আগে সে যখন বাঁদী তখন থেকে সে এই বাচ্চা শেরের দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে যেত। গোলাম কাদেরও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু নবাব জবিতা খাঁ তাকে পরস্তার বাঁদী-বেগম করে নিয়ে গোলাম কাদেরের কদম রুখে দিয়েছিল।

সে লোভও তার আছে। নবাবের বেগম না হোক গোপন প্রেয়সী। কোনটার আশাই সে ছাড়েনি। কিছু ছাড়া তার অভ্যাস

নয়। সে বাঘিনী। ঔরৎশের। সে সব খাবে। একটুকরা হাড় কি মাংস সে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

মালকিনইজমানির কাছে সে যেত। বলে আসত নজফ খাঁয়ের অবস্থা। নজফ খাঁ গেলেই বাদশাহী ভেঙ্গে পড়বে। টাকা ঠিক করে রাখো মালকিন—রোহিলা আফগান দিয়ে দক্ষিণী বর্গীদের ভাগিয়ে দাও। তারপর টেনে নামিয়ে দাও শাহ আলমকে।

এমনি একদিন বাবুজী!

কুছ রোজ ফিরে গিয়েছে ওই বুড়ো মহারাজজী আর ওই গুলবদ্‌নী; হিন্দু সন্ন্যাসী আর তার মুরিদা। খুদাতায়লার নাম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নজফ খাঁয়ের হাবেলীতে—আর ভিতর থেকে হুকুম জারি হয়েছে জেনানীর গলার আওয়াজ—"চুপ করতে বলো। ওইসব গানা গাইতে বারণ কর!

ময় গুলাম ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা—
তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা—
ময় গুলাম—।

বন্ধ্ করো। ভিখ দিয়ে দাও।"

ভিক্ষা এরা নিত না। পাহারাদার নাশাকচি বলত—ভিখ নেবে না।

—ভিখ নেবে না তো ভাগাও। ভাগা দেও।

পাঁচ সাত রোজ দোর থেকে ফিরেছে; কোন কোন রোজ ফটকে শুনেছে খান-ই-খানান সাববাহাদুর হাবেলীতেই নেই। লতাফতের হাবেলীতে কি বজরায় কি কোন বাগিচায় কি যমুনাকিনারায় তাঁবু ফেলে আমোদ করতে গেছে। এমনই ভাবে বেশ কিছুদিন পর এক রোজ বাবুজী মিরজা নজফ খাঁ হাবেলীতে ছিল একা। লতাফৎ খাঁ কালাশের ছিল লতাফতের বাড়িতে। পরভীন গিয়েছিল মালকিনইজমানির বাড়িতে। মিরজা নজফ বেহোঁশ হয়ে পড়েছিল

শরাবের ঘোরে। আর তার বিছানায় রেখে গিয়েছিল পনের যোল বছরের এক নতুন কেনা বাঁদী।

ফকীর বললেন—হজরত রহিমশাহ বলেছিলেন আমার গুরু তাঁর মুরিদকে, বলেছিলেন—বেটা, কভি কভি এইসা হোতা হ্যায় কি, কখনও কখনও এমন হয় যে শয়তানেরও ভুল হয়ে যায়। শয়তানের চেয়ে হিসাবী আর কেউ নয় বেটা। হিসাবের গিঁঠে গিঁঠে সে এমন করে বেঁধে যায় যে একটা পিঁপড়া কি একটা মক্ষিও তার ভিতর দিয়ে গলতে পারে না। হিসাবে এমন যদি হয় যে বহুৎ ভুখার সময় খানা মুখের কাছে ধরেছে কিন্তু সে-খানায় নিমক নাই; খেয়ে তার সর্বনাশ করলে নিমকহারামি হবে না তা হলেও সে মুখের খানা সে ছেড়ে দিয়েছে বেটা। এখানে নজফ আলিকে শরাব খাইয়ে ওই এক কচি লেড়কীকে তাকে দিয়ে তারা বেরিয়ে গেল। গেল গেল হাবেলী ছেড়ে বাইরে চলে গেল। বেটা, নজফ খাঁ শরাব খেয়ে হোঁশ হারিয়ে জানোয়ার বনে গিয়েছিল, ওই বাচ্চি লেড়কী কেঁদেছিল। সেই কাঁদার জন্যে সে তার মুখে থাপ্পড় মেরেছিল—বাচ্চি চিৎকার করে উঠেছিল এবার। নজফ খাঁ তার গলা টিপে ধরেছিল—চুপ!

চুপ করাতে চেয়েছিল। তা চুপ হয়েছিল লেড়কী। সারা জিন্দগীর মত চুপ হয়ে গিয়েছিল। মরে গিয়েছিল হতভাগিনী।

বেটা, হতভাগিনী হয়তো নয়। হতভাগ্যের মন্দনসীবের জুলুম থেকে সে লেড়কী খালাস পেয়েছিল। দুনিয়া তো ছিল তার কাছে তন্দুরের মত—সেখানে সে পুড়ছিল; মুর্গীর বাচ্চার মত সে তো সেদ্ধ হচ্ছিল। তার থেকে সেই জ্বলন্ত উনোনে পড়ে ছাই হয়ে গেল—সে খালাস হয়ে গেল।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, শয়তানের চুক হল। নজফ খাঁয়ের হাতে লেড়কী মরল আর সঙ্গে সঙ্গে হিসাবের চুকের মধ্যে দিয়ে কে তাকে ডাক দিলে!—এ কি হল? এ কি করলি নজফ খাঁ?

বাবুজী, হজরত বলতেন—সঙ্গে সঙ্গে তার চোখেরও ভ্রম এল কিংবা যে শয়তানী সুর্মা সে পরেছিল সেটা মুছে গেল। চোখের আঁসুতে ধুয়ে গেল। নিজের তার ছিল চৌদ্দ পনের বছরের বেটী—তার মুখ আর এই লেড়কীর মুখ যেন এক হয়ে গেল। মিরজা নজফ আল্লার নাম নিয়ে আফসোস করে উঠল, বললে—লা ইলাহি ইল্লালা মহম্মদে রসুলাল্লা এ আমি কি করলাম!

সে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ওই কামরা থেকে।

ঠিক সেই সময়েই এই পুরোহিত আর গুলবদনী নজফ খানের হাবেলীর সামনে কাশ্মীরী ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে ভিখ মাঙছিল। উজীর কোমরুদ্দিন ইন্তিজামউদ্দৌলার হাবেলী নজফ আলি কিনে বাস করত বাবুসাহেব। কাশ্মীরী ফটকের আশেপাশে এখন সব ময়দান হয়ে গেছে; পুরানো হাবেলী-গুলো ভেঙেছে। নজফ আলি জীবনের জ্বালায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল; এসেই শুনলে গান—

পি-ই লে প্যায়লা, হো মাতোয়ালা
প্যায়লা নাম অমিরসকা রে!
বালপনা সব খেলি গোঁয়ায়া
ভয়া নারী বশকা রে।
ব্দ্ধ্ভয়া কফ্-বায়নে ঘেরা,
খাট পড়া ন জায় খসকা রে।

ফকীর বললেন—এ হল সন্ত কবীর সাহেবের ভজনগান

বাবুজী। হজরত রহিমশাহের খুব প্রিয় গান। আচ্ছা গান। হা হা রে। রে মাতোয়ালা পিয়ালা ভরে নামের অমৃতরস পান করে নে রে। সমস্ত বচপন মানে ছেলেবেলা তো কাটিয়েছিস সকাল থেকে সন্ধ্যেতক খেলা করে। তারপর হলি ঔরতের বশ। জোওয়ানী-কালের পুরাটা ঔরতের নেশাতেই কাটে। তারপর বুড়ো হয় বাতে ধরে। হাঁপানি হয়।

বাবুজী, নজফ খাঁ একেবারে চমকে উঠেছিল। কেন কি ওর এই দুটো বছর কেটেছে শরাবের ঘোরে আর ঔরতের পর ঔরতের জোওয়ানী ভোগ করে করে; ওতে আর ছেদ পড়তে দেয়নি পরভীন।

পরভীন শয়তানের পিয়ারী। তার সঙ্গে ওর মহব্বতি। সে জানত এ ভুখাকে জিইয়ে রাখতে হলে নতুনের পর নতুন আওরৎ আনতে হবে; তাই সে আনত। সময়মত নিজেকে দিত। তারপরই নিজে সরে এসে নতুন কাউকে এগিয়ে দিত। এই জালিমী করে তার এই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়সেই সে নিজেকে খরচ করে ফেলেছিল। জোওয়ান বয়সেই বুড়ো হয়ে পড়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ধরেছিল বেমারিতে।

হাঁপানি বাত। তার সঙ্গে আরও অনেকরকম। দেহের কষ্টের বাকী ছিল না। কিন্তু জখম হওয়া বাঘ যেমন নিজের দেহের জখমী খাঁ তার করকরে জিভে চেটে ওই ক্ষত থেকে ঝরা নিজের রক্ত খেয়ে সুখ পায় তেমনিভাবেই সে এই দিনরাত্রি ব্যভিচারে আর মাতোয়ারিতে সুখ পেত। তারই মধ্যে দিয়ে সে চলেছিল জাহান্নমের পথে মরণের পথে। কিন্তু সে বুঝবার ফুরসৎ তার মিলত না। এরা দিত না।

নজফ খাঁ শেরের মত মর্দানা ছিল। ইমানও তার ছিল। সে চেষ্টাও করছিল বাদশাহীকে খাড়া করতে। এলাহিবাদে সে শাহ

আলমের কাছে কোরান হাতে করে কসম খেয়েছিল হলফ করেছিল —সে তা রাখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পরভীন লতাফৎ কালাশের এরা তা দেয়নি। দেবে কি করে বাবুজী, দেবার উপায় কি? ইমান বাঁচলে ইসলাম বাঁচলে ইনসানিয়াত বাঁচলে সে মুল্কে তারা চোর বনে যায়—শেষ তারা মরে যায়। তারা শয়তানের সিপাহী। পয়গম্বর রসুলের শাহী বরবাদ করে শয়তানশাহী কায়েম করবার জন্যে তারা চেষ্টা করছিল। কিন্তু খুদার মর্জি আর ইনসানিয়াতির কানুন—তা হয় না। যে পানি বাবুজী নীচের দিক ছাড়া চলে না চলতে পারে না তাই সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশে ওঠে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ফকীরসাহেব।—তারপর চিৎকার করে হেঁকে উঠল—একেবারে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল—নিয়ে আয়—ওই গীত গাইছে যারা তাদের নিয়ে আয়। নিয়ে আয়।

* * *

সেই দিনই নজফ খাঁ ছুটে এল সন্ধ্যার সময় লালকেল্লায়। বাদশাহ তখন দু চারজন দেউলে-পড়া আমীরের সঙ্গে বসে আপসোস করছিল, আর নিজের তৈরী বয়েৎ আওড়াচ্ছিল। আফিংয়ের নেশায় বাদশাহী বয়েৎ খুব জমে উঠেছিল। সামনের থালাতে পানের খিলি আতর মসলা ছিল বাবুজী—তবে সে নেহাতই অল্প।

হিন্দুস্তানের বাদশাহী হল ফকীরশাহী; তখন খুদা বললেন —আজ থেকে ফকীরি নিলে আমাকে মিলবে না। মিলবে শয়তানকে। বাদশা শাহ আলম বলে—আমি বাদশাহী ছাড়তে পারছি না— ফকীরিতে আমার লোভ নেই। খুদা, তোমাকে চাইবার আমার ভরসা নাই—শয়তানকেও ভয় করি না কিন্তু তাকেও চাই না।

আমি চাই কিছু দৌলত কিছু ইজ্জৎ কিছু ভাল খানা কিছু কড়া আফিং আর শান্তি।

ঠিক এই সময় নাশাকচি এসে খবর দিলে খানখানান মীর নজফ খাঁ এসেছে—বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবে। একেবারে একা আসবে। তার সঙ্গে কোন হাতিয়ার নাই। বাদশাহের সঙ্গে তার গোপন কথা আছে।

একেবারে বাদশাহের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে পায়ের উপর মুখ রেখে নজফ খাঁ কেঁদেছিল বাবুজী। পুরা একঘড়ি ধরে কেঁদেছিল আব মাফ চেয়ে বলেছিল—শাহানশাহ জাঁহাপনা গোলামকে মাফ্ করুন। আমার কসুরের শেষ নাই আমার গুনাহের অবধি নাই পার নাই। আমি শয়তান আর শয়তানীর হাতে পড়েছি জনাব। আমি দেখতে পাচ্ছি খুদা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বিমুখ হয়েছেন খুদা। পয়গম্বর রসুল ক্রোধ করেছেন। আমার সারা দেহ ব্যাধিতে জর্জর হয়েছে তবু এর উপর গুনাহে গুনাহে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছি। আমি জাঁহাপনাকে বহুৎ নুকসান করেছি! আমার শরমের আর শেষ নাই।

নিজেও তখন দেউলিয়া হয়ে এসেছে নজফ খাঁ। তবু সেদিন সে এক থলি মোহর বাদশাহকে দিয়ে এসেছিল।

নজফ খাঁয়ের কান্না দেখে বাদশাহের চোখেও জল এসেছিল।

বাদশাহ বলেছিল—নজফ খাঁ, তুমি আর একবার খাড়া হয়ে ওঠো। বাঁদী পরভীনকে ছাড়ো লতাফৎকে ছাড়ো। কালাশেরকে বাড়ি ঢুকতে দিয়ো না। হাকিম দেখাও, কবিরাজ দেখাও, নয়তো ফিরিঙ্গী ডাগডর দেখাও। খাড়া হও।

এতে আরও কেঁদেছিল নজফ খাঁ।

বাদশাহের পায়ের উপর চুম খেয়ে কদমবুঁচী করে কাঁদতে

কাঁদতেই বাড়ি ফিরেছিল। বলে এসেছিল—জাঁহাপনা, মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম—ইরান থেকে হিন্দুস্তানে এসে শুধু নিমককে মেনে ইমানকে মাথায় করে বুকের সাহস আর তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্তানের বাদশাহীর সব সব থেকে বড় আমীর হয়ে শেষ শয়তানের ফেরে হারালাম। আমার জিন্দগীকে পুরা বরবাদ করেছি আমি। আমার আর দিন নেই জনাবআলি।

বাড়ি ফিরে এসে নজফ খাঁ বান্দাদের হুকুম করেছিল—সমস্ত বাড়ি সাফাই করো। ধুয়ে ফেলা নাচওয়ালীদের বিদায় করো। শরাবের বোতল ভেঙে দাও। ধূপ লাবান জ্বেলে দাও। মৌলভীকে ডাকো—কোরানশরীফ পড়বেন। আরও ডাকো সেই বুড়ো হিন্দু সন্ন্যাসীকে আর তার সেই মুরিদাকে। ভজনগান শুনব। বহুৎ মিঠা। ময় গুলাম ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা—তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা।—ডাকো তাদের। কোথায় গেল তারা?

কোথায় গেল তারা? নজফ খাঁ তাদের বসিয়ে রেখেই গিয়েছিল। সে ঠিক করেই গিয়েছিল সে সব ছাড়তে চেষ্টা করবে। তার জন্য এই গান তাকে শুনতে হবে।

বান্দারা নজফ খানের হাতে নাঙ্গা তরোয়াল দেখে ভয়ে কবুল করলে—পরভীন বেগম ফিরে এসে সব শুনে ওই বুড়োকে আর তার মুরিদাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে ছিল তার কালাশের।

একরকম ধরেই নিয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে পরভীন। নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নজফ খাঁ গিয়েছিল লতাফৎ খাঁর হাবেলী।

লতাফৎ খাঁর হাবেলীতে লতাফৎ খাঁ শরাবের বোতল নিয়ে বসে—

তিনটে রাস্তার নাচওয়ালী সারেঙ্গীদার আর দুটো বাজীগর নিয়ে সে এক মাইফেল জুড়ে দিয়েছিল।

পরভীন কোথায় সে-খোঁজ সে জানত না। জানবার ফুরসৎ ছিল না। এই তিন ছোকরী নাচনেওয়ালীকে নিয়ে এসেছে সে খান-খানানের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে। পরভীন ডুলি চড়ে গিয়েছিল মালকিনইজমানির বাড়ি সে এই পর্যন্ত জানে। এর বেশী তো জানে না।

—জানবার তো কথা নয় খান-ই-খানান! খোজা লতাফৎ খাঁ জবিতা খাঁয়ের তালাক দেওয়া পরস্তারকে সাদী করেছিল জবিতা খানের দামাদ খান-ই-খানান মীর নজফ খানের জন্যে। এ কথা তো সারা হিন্দুস্তানে ছাপি নেই। আর হিন্দু ফকীর আর তার মুরিদা—তাদের কথা তো লতাফৎ কিছু জানে না।

তবে হ্যাঁ। কালাশের জানতে পারে!

খান-ই-খানানের বাড়ি থেকে বের হবার সময় লতাফৎ বলেছিল—মালকিনইজমানির বাড়ি কেন? কোন মতলব?

পরভীন বলেছিল—মেহমান এসেছে আমার। কালাশের খবর দিয়েছে। মালকিনইজমানির বাড়িতে তার সঙ্গে মুলাকাত হবে।

সে-মেহমান কে—নতুন কেউ—মানে শাহজাদা বিদরভক্ত কিনা সন্দেহ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—পরভীনবানু কি এবার বাদ-শাহীর দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

হেসে পরভীন বলেছিল—হাঁ পরভীনের নসীবই তাই। ভাগ্যে জবিতা খাঁ জুটল তো সে খেলাৎ ভেজে দিলে। দিলে দিলে, দিলে এক খোজা খান-ই-খানানকে। পরভীন বেগমের কেরামৎ আর তার এলেম—সে পাকড়ে নিয়েছে খান-ই-খানান মীর নজফ খানকে। কিন্তু এখানেও পরভীনের নসীব; লোকটার ঔরতের ভুখা হাজার ঔরতে মেটে—এক ঔরৎ—সে পরভীনবানুর মত ঔরৎ হলেও মেটে না! ফের

সে যদি কোন নতুন নাগরই পাকড়ায় তবে কি সে ওই দুবল দুবলা কিতাব পড়নেবালা মাক্ষনের (মাখন) মত নরম, ফুলের গাছের মত এক ঝটকায় পড়ে যায় যে নাগর তাকে পাকড়াব ? দুসরা মেহমান জী ! বহুৎ জবরদস্ত জঙ্গী জওয়ান।

—খান-ই-খানান, আপনি তো জানেন এই বেশরমী ভেলকি-বালী পরভীনকে। নাঙ্গা তলোয়ার আপনি নামান উর্জ়রসাব। বসুন। তসরীফ রাখতে হুকুম হোক। এই পথের নাচওয়ালীরা আশ্চর্য জনাবআলি। যেমন নাচ তেমনি গান তেমনি জাদুগরের জাদু—ভেলকি—

না—। বলে বেরিয়ে আসছিল নজফ খাঁ। ভাবছিল পরভীন হয়তো এতক্ষণ তার বাড়িতে ফিরে থাকবে।

ঘোড়াতে সওয়ার হবার জন্যে রেকাবে পা দিয়েছে নজফ খাঁ আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই লহমাটিতেই বাবুসাহেব এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। রাত্রি তখনও প্রথম প্রহর পার হয়নি। লালকেল্লার ঘড়ি নিয়মিত আজকাল বাজে না তবুও এখানে ওখানে দু চার জায়গায় বাজে। তা বাজেনি। কাশ্মীরী ফটকের থেকে কসবীপাড়া খুব দূরে নয়। কাছেই। সেখানে তখন খুব বাজনা গান চলছে আলো জ্বলছে। বাজারের দোকানে দোকানে তখনও কেনাবেচা চলছে পুরা-দমে। কাল্লিখানার তাড়িখানায় হাসির হুল্লোড় উঠছে মধ্যে মধ্যে কথাকাটাকাটি চলছে। মুশকিল আসান ফকীরেরা চেরাঘ আর চামর হাতে গৃহস্থপাড়ায় ফিরছে। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সারা আসমান যেন সবুজ আলোয় এমন আলো হয়ে উঠল যে মনে হল একটা নয় দুটো নয় একসঙ্গে আসমানে দশ দশ সবুজ আলো-ওয়ালা সূর্য উঠল। আর সে সূর্য আকাশের সমস্ত তারাকে চাঁদকে তার নিজের আলোর আড়ালে ঢেকে দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে এ

দিগন্ত থেকে ও দিগন্তের দিকে ছুটে গিয়ে তার আড়ালে হারিয়েই গেল অথবা নিভে গেল।

সারা দিল্লী চমকে উঠল। একটা কলরব করে সকলে চিৎকার করে উঠল।

সে চিৎকারের মধ্যে খুদ শয়তানও যে শয়তান সেও চেঁচিয়ে উঠল—খুদা আল্লা জান বাঁচাও!

হে ভগওয়ান প্রাণ রাখো!

*　　　　*　　　　*

তবারিখে দেখো বাবুজী—এ ফকীর তোমাদের মত ইংরিজী-ওলা নয় কিন্তু ঝুট বাত সে বলছে না—দেখো তোমাদের ইতিহাসে নিশ্চয় থাকবে—ওই সালে ওই হিজরাতে প্রথমে বেমারি তারপর আঁধি তারপর ভূমিকম্প—সবশেষে বাবুজী আসমান থেকে এক তারা খসে পড়েছিল। সে আলো শুধু দিল্লীর লোক নয় সারা হিন্দুস্তানের লোক দেখেছিল। হিন্দুস্তানের আসমান আলো হয়ে উঠেছিল।

হজরত রহিমশাহ বলতেন—লোকে এর মানে বুঝতে পারেনি। আজমীঢ় শরীফে রোগা শরীর নিয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম গুলবদনী শঙ্করবাঈ সে চলে গেল আসমান আলো করে দিয়ে। শয়তানকে খতম করে দিয়ে। খুদ শয়তান কালাশেরকে খুন করেছিল গুলবদনী। গুলবদনীকে খুন করেছিল পরভীনবানু।

পরের দিন দুটো লাশ পড়ে ছিল যমুনার ওপার থেকে যে পথটা শাহদারা হয়ে চলে গিয়েছে সেই পথের ধারে একটা প'ড়ো মন্দিরের চত্বরে।

তার পাশে হতভম্ব পাগলের মত বসে ছিল অমৃতেশ্বর শিউজীর সেই বুড়ো মহারাজজী।

(পনের)

বাবুজী, হজরত রহিমশাহ আরও বলতেন—ওই সবুজ আলো সারা আসমান জমিন আলো করে চলে গেল—আমি বুঝতে পারলাম। কিছু করবার সময় তখন আর ছিল না। শক্কর ভুলে গিয়েছিল —আমাকে ডাকতে ফুরসৎ পায়নি। সে আমাকে তাই বলেছিল।

হজরত গুরু বলতেন—আলোটা মিলিয়ে গেল—আমি বহুৎ দুঃখের মধ্যে বসে রইলাম। দেহে অসুখ ছিল—বাত হয়েছিল: এক মুরিদের বাত ভাল করে দিয়ে সে বাতরোগ নিজে নিয়ে তাকে হজম করছিলেন। সেই বাতের যন্ত্রণায় ঘুম আসেনি। বাকী মুরিদরা সব ঘুমিয়ে গিয়েছে। তখন কে যেন ডাকলে—বাবাসাহেব হজরত!

গলা চেনা মনে হল—তারপরই সে মিঠি আওয়াজ চিনলাম—সে আওয়াজ শক্করের। চমকে উঠলাম। শক্করের আত্মা তো আলোর তুফান তুলে চলে গেল। তবে কি ভুল হল আমার!

শক্কর বললে—না হজরত আপনার কি ভুল হয়, না, হতে পারে। আপনি ঠিক দেখেছেন। আমি যেতে যেতে হজরতের কাছে এসেছি —আমার শেষ আরজি পেশ করতে এসেছি।

অশরীরী শক্করবাঈ, নটীর মেয়ে গুলবদ্‌নীরই আত্মা পরলোকে যেতে যেতে নাকি ফিরে এসে হজরত রহিমশাহকে বলে গিয়েছিল কি হয়েছিল আর পেশ করে গিয়েছিল তার আরজি। কে মেরেছিল কালাশেরকে—কে মেরেছিল গুলবদ্‌নীকে।

*　　　*　　　*

পরভীন লতাফৎ খাঁকে বলেছিল তার মেহমান এসেছে মালকিনই-জমানির বাড়ি। সে মেহমান গোলাম কাদের। রোহিলখণ্ডে ঘাউস-

গড়ে জবিতা খাঁ শেষ শয্যায় শুয়েছে। আর খুব বেশী দিন নেই তার। গোলাম কাদের তরাই থেকে নেমে এসেছে। জবিতা খাঁয়ের পর সে হবে রোহিলখণ্ডের নবাব। তার ভাইদের জন্য সে চিন্তিত নয়, সে চিন্তিত ছিল ভগ্নীপতি নজফ খানের জন্যে। বাদশাহের মীরবক্সী উজীর একসঙ্গে নজফ খাঁ। সে হাত বাড়ালে শক্ত হবে। কিন্তু নজফ খাঁয়ের সব খবর সে জানত। তাই এসেছিল পরভীনের কাছে। এবং মালকিনইজমানির কাছেও। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে একটা কথা মালকিনইজমানির হয়েছিল। শাহজাদা বিদরভক্তকে মসনদ দিতে পারলে মালকিনইজমানি জবিতা খাঁকে বলেছিল এগার লাখ টাকা মিলবে তোমার। তার সাক্ষী পরভীন। সেটা সে নতুন করে বলে নিতে এসেছিল।

কথাবার্তা বলে পরভীন কালাশেরকে নিয়ে নজফ খানের বাড়িতে এসে দেখেছিল নজফ খাঁ নাই। শুনেছিল নজফ খাঁ পাগলের মত ছুটে গিয়েছে বাদশাহের কাছে। আর দেখেছিল শঙ্করবাঈ এবং মহারাজজীকে। নজফ খাঁ বলে গেছে এরা থাকবে। ফিরে এসে খাঁ গান শুনবে এদের কাছে। খবর শুনেছিল শরাবের বোতল ফেলে দিতে হুকুম হয়েছে। বাইরের তরফটা সাফা হচ্ছে। যার ঢেউ চলে গেছে হারেম পর্যন্ত, নজফ খাঁয়ের দিদি খাদিজা সুলতান পর্যন্ত চকিত হয়ে উঠেছে। তখন পরভীন কালাশেরকে বলেছিল—কি দেখছ? বুঝতে পারছ না কি হয়েছে?

কালাশের বোকা নয়। সে বুঝেছিল। এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরভীনকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার সময় সে ওই মহারাজ আর ওই শঙ্করকে জবরদস্তি করে ডুলির মধ্যে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যাবে? পরভীন বলেছিল—চলো রোহিল-খণ্ড। খবর পাঠাও গোলাম কাদেরকে যে সে যেন এখুনি বেরিয়ে পড়ে। নজফ খাঁ বাদশাহের কাছ থেকে ফিরে একবার হয়তো শেষ-

বারের মত তলোয়ার ধরে শোধ নিয়ে যেতে চাইবে। আমাদের জান যাবেই। কাদেরের খবর পেলে সে তাকেও ছাড়বে না।

যমুনা পার হয়ে শাহদারা হয়ে চলে গিয়েছে শেরশাহী সড়ক; সেই সড়ক ধরে তারা এসে পৌঁছেছিল এক মন্দিরের ধারে। প'ড়ো মন্দির। সামনে বাঁধানো চত্বর। সেইখানে এসে ডুলি নামিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল গোলাম কাদেরের। রাস্তায় দু দুজন সওয়ার রেখে দিয়েছিল পরভীনের নিশান দিয়ে যারা নিয়ে আসবে গোলাম কাদেরকে সেখানে।

কালাশের শয়তান।

তার রাগ শয়তানের রাগ।

নিদারুণ আশাভঙ্গে সে বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছিল। সেই মন্দিরচত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অস্থির পদক্ষেপে। শঙ্কর দেখছিল তার সেই জানোয়ারের মত পা দুখানা। বাঁকা মোচড়ানো। তাতে চামড়া কেটে জড়ানো। তাই তার জুতোয় খটখট শব্দ ওঠে। মধ্যে মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছিল ওই মহারাজ আর ওই শঙ্কর মেয়েটির সামনে। হাতে পায়ে বাঁধা ছিল তারা। চত্বরের উপর ফেলে রেখেছিল। পড়ে ছিল পাহারার মধ্যে। অকস্মাৎ কালাশের এসে শঙ্করকে টেনে তুলে বাঁধন খুলে টেনে হেঁচড়ে এনেছিল খানিকটা এপাশে।

কালাশের খোজা।

তবু তার লালসার শেষ নেই। শঙ্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হিংস্র জন্তুর মত।

চিৎকার করেও উঠেছিল শঙ্কর।

হজরত রহিমশাহ বলেছিলেন—আমি শুনতে ঠিক পাইনি বেটা। সে ডেকেছিল বুড়ো মহারাজকে—কিন্তু হাত পা বাঁধা অন্ধা বৃদ্ধ কি করবে? শঙ্কর যদি ভগবানকে ডাকত খুদাকে ডাকত

তাহলে আমি শুনতে পেতাম বেটা। শক্কর তা ডাকেনি। ডেকেছিল ওই বুড়ো মহারাজকে—তারপর ডেকেছিল নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে।

গোলাম কাদের ঠিক সেই মুহূর্তে এসে নেমেছিল ঘোড়া থেকে সেই চত্বরের উপর। শক্কর তাকে দেখে চিনেছিল এবং তাকেই ডেকেছিল।

হজরত রহিমশা বলেছিলেন—তাই ডাকে। ঔরতে তাই ডাকে—যাকে ভালবাসে যাকে সে নিজেকে দিতে চায় তাকেই সে ডাকে। খুদাকেও মনে পড়ে না পয়গম্বরকেও না গুরুকেও না। কাউকেই না। সে চায় ওই ভালবাসার মানুষই তাকে বাঁচাক। এই হল ত্নিয়ার কানুন। বড় মিঠা কানুন।

কালাশেরও খুশী হয়ে উঠেছিল গোলাম কাদেরকে দেখে। সে বলেছিল—নবাবজাদা, একদিন বামনওলীর বাগিচায় বলেছিলাম লেড়কীকে ভোগ করলে হয়ে গেল—এবার ওকে শেষ করে দিয়ে যাও। এ লেড়কী দিয়ে কাজ হবে না। এ হল রহিমশায়ের মুরিদা। আর এর মনের ভেতর একটা কিছু আছে। ও পোষ মানবে না। খুদার নাম ভুলবে না। তুমি ছুরি বসিয়েছিলে কিন্তু ঠিক কলিজায় বসাতে পারনি। আজ তোমাকে বসাতে হবে। পহেলে ওকে ভোগ করো। নাঙ্গা করো। সবার সামনে।

গুলবদনী শক্করবাঈয়ের আত্মা বলেছিল—হজরত গুরু, নবাবজাদা গোলাম কাদের নিজের প্রাণের জন্যে একদিন কালাশেরকে বলেছিল—আমার জান বাঁচাও আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

কালাশের তাকে হলফ করিয়ে নিয়েছিল। কড়া আরক খাইয়ে-ছিল, চোখে আশ্চর্য সুর্মা পরিয়ে দিয়েছিল। জানও বাঁচিয়েছিল।

নবাবজাদাও কালাশেরের আরক খেয়ে খেয়ে তৈয়ারী হয়েছে।

তবু নবাবজাদা মানুষ—নবাবজাদা তখন নওজোয়ান। যখন মহব্বতির জন্যে মানুষ জান দেয়। নবাবজাদা সেই বাম্‌নওলীর বাগিচার মধ্যে ওই কালাশেরের আরকের ঝোঁকে তারই আশকারায় ইমান নষ্ট করে আমার ইজ্জত নষ্ট করেছিল। তারই মধ্যে হজরত সে আমাকে ভালওবেসেছিল।

হজরত, আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম সে তো তুমি জানো, তোমার কাছে তো ছাপি নেই হজরত। সে কথা আমার দাদাজী মনিয়ার সিংকে দিয়ে নবাবজাদাকে জানিয়ে আরজি করেছিলাম, নবাবজাদা, এই নটীর বেটীর নটীধরম অনুসারে তুমিই আমার স্বামী।

মনিয়ার সিং যাওয়ার পর ভূমিকম্প হল—আমরা নিরুদ্দেশ হলাম, এলাম দিল্লী। তবু মনিয়ার দাদাজী নিশ্চয় তাকে বলেছিল এই গন্ধর্বীর কথা। তাই বলছি। তাই নবাবজাদা কালাশেরের কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলেছিল—এ কৌন? কে তুমি?

আমি বলেছিলাম—জনাবআলি, আমি শঙ্কর। তোমার বাঁদী—

নবাবজাদা বলেছিল—বাম্‌নওলীর নওজোয়ানী?

হজরত—!

অশরীরী শঙ্কর বলেছিল—হজরত, আমি হঠাৎ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম নবাবজাদাকে।

কালাশের হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল—আচ্ছা আচ্ছা! প্রথমে ওকে তুমি ভোগ কর নবাবজাদা—হাঁ! তারপর—।

বলে সে ছুটে এসে আমার ওড়নার মোটা চাদরখানা টেনে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে চেপে ধরেছিল আমার কামিজ, দুই হাত দিয়ে টেনে ফালি করে ছিঁড়ে আমাকে নাঙ্গা করে দিতে চেয়েছিল।

আমি নবাবজাদার পা চেপে ধরে বলেছিলাম—আমি তোমার বাঁদী

—আমার শরম বাঁচাও। আমার রুস্তম! আমার কিষণজী! আমার রামচন্দর!

কালাশের একটা নিষ্ঠুর চিৎকার করে চেপে ধরেছিল আমার চুল। গালে মেরেছিল চড়। বীভৎস সে চিৎকার!

সঙ্গে সঙ্গে গোলাম কাদের নবাবজাদা দপ্‌ করে যেন জ্বলে উঠল—আওয়াজ করে যেন বারুদের বোমা ফেটে গেল। সেও একটা চিৎকার করে ঠাস করে চড় মারলে কালাশেরকে।

কালাশেরও চমকে উঠল। কিন্তু সে চমক এক লহমার জন্যে। তারপরই সে চেপে ধরলে নবাবজাদার গলা।—তুমি নিজে বেচেছ আমার কাছে—তোমার মনে নাই?

হজরত, আমার নজরে পড়ল নবাবজাদার কোমরবন্ধে গোঁজা রয়েছে ছোরা। আমার কি হল জানি না—আমি টেনে সেই ছোরা বের করে নিয়ে বসিয়ে দিলাম কালাশেরের কলিজায়।

হজরত গুরু, তুমি হয়তো সে সময় আমাকে বল যুগিয়েছিলে, খোদা মেহেরবান, গরীবানের 'ভরোসা' পয়গম্বর রসুল দুর্বলের বল; আমার বুকে সাহস এল—হাতের কব্জিতে বল এল কোথা থেকে—ছোরাটা বসে গেল ঠিক কলেজার মাঝখানে। একটা চিৎকার করে পড়ে গেল কালাশের। তার সে জানোয়ারের মত বাঁকাচোরা অদ্ভুত পা দুখানা জন্তুর মতই সে ছুড়তে লাগল।

হজরত, আমি দেখছিলাম। গোলাম কাদের কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল, কালাশের তাকে বললে—এ খুনের বদলা আমি নেব। তোমার খুন। দেনা আমার শোধ চাই।

হজরত নবাবজাদা গোলাম কাদের কালাশেরের আরক থেকে আর মানুষ নয় জনাব—সে পুরা জানোয়ার হয়ে গেছে—জনাব, সে তার আত্মাকে বেচেছে শয়তানের কাছে—সে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইল। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার বুকে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা

অনুভব করলাম, হজরত, এবারও খোদাকে মনে পড়ল না পয়গম্বরকে মনে পড়ল না—গুরু, তোমাকে মনে পড়ল না। পড়ল নবাবজাদাকে। নবাবজাদাকেই ডেকেছিলাম আমি। তারপর পড়ে গেলাম।

হজরত, পরভীন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

সে-বিহ্বলতা কাটতেই সে উঠে তার নিজের ছোরা খুলে বসিয়েছে আমার বুকে।

হজরত, আমি বেঁচেথাকলে পরভীন নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে নিয়ে খেলতে পারবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সারা আসমান আলোয় আলোয় যেন তুফান বইয়ে দিয়েছিল।

আমার আত্মা দেখলে একটা 'টুটতা সিতারা', শিহার। আসমানের এক তরফ থেকে আর এক তরফ পর্যন্ত ছুটে চলে গেল।

হিন্দুর শাস্ত্রে মুসলমানের শাস্ত্রে সব শাস্ত্রেই বলে এমন উল্কাপাত একটা ভীষণ বিপদের ইশারা।

হজরত, পরকালের সীমানায় এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছি সে বিপদ আসছে। কালাশের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছে। সে শোধ নেবে।

আমার আরজি হজরত, আমার দেহটা পড়ে আছে শাহদারার ধারে—আপনি আমার কবরের ব্যবস্থা করবেন। আর যেদিন নবাবজাদা গোলাম কাদের তার দেনা শোধ করবে, করতে তাকে হবে হজরত—সে আপনি জানেন, সেদিন ওই কবরেই তাকে আমার পাশে শুইয়ে দেবেন। যেন জন্মজন্মান্তরেও কালাশের তাকে গোলাম বানিয়ে না তুলতে পারে। তার আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা তুমি করো তোমার মুরিদার এই আরজি।

(ষোল)

ফকীরসাহের বললেন—বাবুজী, সেই কবর হল এই আগ্রা থেকে অল্প দূরে। মথুরা পার হয়ে। হজরত রহিমশাহের একটা আস্তানা ছিল সেখানে। তিনি তাঁর মুরিদার আরজি মঞ্জুর করেছিলেন।

বাবুসাহেব, তবারিখে ইতিহাসে আছে তুমি এসব আমার থেকেও ভাল জান—ক'বছর পর গোলাম কাদেরের দুই চোখ প্রথম উপড়ে নেওয়া হয়—তারপর কাটা হয় নাক কান তারপর আঙুল তারপর গর্দান। দুই চোখ, দুই কান, নাক, আঙুল একটা ঝাঁপির মধ্যে পুরে পাঠানো হয়েছিল বাদশাহ শাহ আলমের কাছে। বাদশাহের হুকুম ছিল। কেটে পাঠিয়েছিল মাহাদজী সিন্ধিয়া। মারাঠা সর্দার। বাদশাহ শাহ আলমও তখন অন্ধ। দুই চোখ ছিল না। ছিল দুটো বীভৎস গর্ত। বাবুসাহেব, সেও তুলে নিয়েছিল ওই গোলাম কাদের। কালাশের তখন ছিল না কিন্তু শয়তান ছিল। শয়তানের পরস্তার ছিল পরভীন; সেই ছিল গোলাম কাদেরের সব।

* * *

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছিল: শাহানশাহ বাদশাহ জেলালুদ্দিন আকবরশাহের সমাধিস্থল সেকেন্দ্রার এক কোণে বসে বৃদ্ধ ফকীর গল্প বলে চলেছিলেন। দর্শকের ভিড় বাড়ছিল। মোটরের আনা-গোনা বেড়েছে। ইলেকট্রিক হর্ণের আওয়াজ ইঞ্জিনের শব্দ বাল্‌ব হর্ণের ষাঁড়ের চিৎকার পেট্রোলের গন্ধে এতক্ষণ ধরে যে একটি অবাস্তব প্রাচীন অপ্রাকৃত সংস্কারসম্ভূত বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এই সেকেন্দ্রার মত একটা পুরনো প্রাসাদের স্বপ্ন দেখছিলাম তা ভেঙে গেল।

আফজল ধূপদানিতে লাবান ধূপ জ্বেলে দিচ্ছিল। মুসল-

মানেরা সন্ধ্যায় নামাজ পড়ছিল। ফকীরসাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। নামাজ পড়বেন। আমি সরে এসে বসলাম। শুনে যাব, শুনেই যেতে চাই বাকীটা।

ইতিহাসের কথা জানি।

বাদশাহ শাহ আলম, জবিতা খাঁ, গোলাম কাদের, মীর নজফ খাঁ, খোজা মনসবদার লতাফৎ খাঁ, আবদুল আহাদ, মাহাদজী সিন্ধিয়া, খোজা নাজির মনজুর আলি, মালকিনইজমানি—সবাই সত্য। পরভীন, নামটি বাদে ওই শয়তানী নারী সেও সত্য। ইতিহাসে আছে—The serpent that caused Nazaf Khan's fall was Latafat Ali Khan a eunuch general and a brother Shia. This man introduced to Nazaf Khan's notice a woman of bewitching fascination but abandoned character whom Latafat had wedded; and entering Nazaf Khan's private wine parties as a handmaid in attendence soon made herself his mistress and the minister of his pleasure in respect of other woman

ফকীর তার নাম বললেন পরভীন।

পরভীন তাঁর কাছে শয়তানের সহচরী। শয়তান কালাশের। শয়তানের কথা সেকালের মানুষেরা শুধু নয় সেকালের ইতিহাস যারা লিখেছে তারাও স্বীকার করেছে। খয়রুদ্দিন বলে গেছে—বলে গেছে গোলাম কাদের শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিল।

শয়তান তাকে তার পথে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল। সে চলেছিল। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়নি।

ফকীর বলেছেন—গুলবদনী শঙ্করের আত্মা হজরত রহিমশাকে বলেছিল—হজরত, একবারের জন্য এই নটীর বেটী এই

গন্ধবী কুমারী শঙ্করবাঈয়ের জন্যে গোলাম কাদের থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে ভালবেসেছিল এই গন্ধর্বিনীকে। আর সেই গন্ধর্বিনীও তাকে ভালবেসেছিল। সে ছোরা মেরে খুন করেছিল কালাশেরকে। যদি তা না করত তাহলে হয়তো গোলাম কাদেরকে এমন করে চোখ কান নাক আঙুল কেটে দিয়ে গর্দান দিতে হত না। শয়তান হয়তো তাকে মসনদে বসাতো।

মসনদের খুব কাছে এক হাত দূরে গিয়ে হাজির হয়েছিল গোলাম কাদের। হাজির করে দিয়েছিল শয়তান। আর সাক্ষাৎ শয়তানই হয়েছিল সে।

ফকীরসাহেব বললেন—ওই পরভীন অসামান্য রূপবতী কলাবতী লীলাবতী কাশ্মীরী কন্যা তাকে কড়া আরকে আর তার যৌবন্‌রসেব নেশায় প্রমত্ত করে রেখেছিল।

ইতিহাসেরও কোন প্রতিবাদ নেই। গোলাম কাদের যৌবনমদমত্ত নারীবিলাসী ব্যভিচারী এবং মদ্যপ ছিল। জবিতা খাঁয়ের পরিত্যক্ত শুষ্ক রিক্ত রোহিলখণ্ডে মেঝে গোঁড়া ঘাউসগড় পাথলগড়ে বসে মদ আর নাচ গান ও নারীবিলাসেই তৃপ্ত ছিল না, মনের মধ্যে বুকের মধ্যে সেই সনাতন অনির্বাণ প্রতিশোধ কামনার আগুন জ্বেলে রেখেছিল—এবং ঘাউসগড়ের পাথলগড়ের রিক্ততার দিকে তাকিয়ে তাতে আহুতির পর আহুতি দিয়ে তাকে আরও বেশী জ্বালিয়ে তুলতে চেয়েছে।

তারপর এল সুযোগ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হিন্দুস্তান। শত সহস্র দ্বন্দ্বে কলহে বিদীর্ণ এবং ভিন্ন। স্বার্থের দ্বন্দ্ব ধর্মের দ্বন্দ্ব, মর্মের দ্বন্দ্ব, হিংসার ফলে প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বের আর শেষ কোথায় ছিল তখন।

একালের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে

বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর বিচার করে একে বলেন মানবসভ্যতার একটি বিশেষ স্তর থেকে নূতন স্তরে উত্তরণকালের স্বাভাবিক অবস্থা; একটা বিশাল পুরাতন প্রাসাদের কালক্ষয়ে ক্ষয়ে ফাটলে ফাটলে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া। এখন অপেক্ষা শুধু একটি কম্পনের বা একটি ঝড়ের বা একটি প্লাবনের বা একদল শস্ত্রপাণি মানুষের আবির্ভাবের।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় নবাব রাজা রানারা শিখ সর্দারেরা রাজপুতেরা জাঠেরা বর্গীরা শিয়ারা সুন্নীরা আফগানেরা মুঘলিয়ারা তখন স্বপ্ন দেখছে এক একটি ছোট স্বাধীন রাজ্যের এবং সেখান থেকে যাত্রা করে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের।

বাদশাহের দরবারে উজীরী নিয়ে ষড়যন্ত্র।

ওমরাহদের মধ্যে দুটো ভাগ তিনটে ভাগ চারটে ভাগ।

মিরজা নজফ খানের মৃত্যুর পর।

মিরজা নজফ ওই রোগ থেকে সারেনি। খাড়া হওয়া তার হয়নি। বাদশাহের পায়ে মুখ রেখে কেঁদে এসেই যতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হয় করেছিল। তারপরই সে মারা গেল। পরভীনকে অভিসম্পাত সে দিক—তার মত মনোহারিণী সর্বনাশীর অভাবে সে যে দীর্ঘ-নিশ্বাস এবং চোখের জল ফেলেছিল তার কিছুটা কাব্যে সে গাঁথতে চেয়েছিল।

তার নিদর্শন কিছু নেই। ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে-কালে সম্পন্ন হলেই মানুষেরা কবি হতে চাইত। বাদশাহ শাহ আলমের গজল রুবাই আছে—মিরজা নজফেরও ছিল নিশ্চয়। হয়তো নজফ লিখেছিল—তৈরি করতে চেয়েছিলাম একখানি সুখের ঘর, অর্জন করতে চেয়েছিলাম পুণ্য, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম দেবতার আসন কিন্তু হায় নসীব আর হায় কুহকিনী নারী তুমি যা বললে তাই করলাম—যখন শেষ হল তখন দেখলাম তৈরি করেছি

কবর, অর্জন করেছি পাপ, তৈরি করেছি শয়তানের আসর। আর ঠিক তখনই তুমি সকল মোহ টুটিয়ে দিয়ে কি ভয়ংকর হাসি হেসেই না ছুটে পালিয়ে গেলে!

থাক। কল্পনা করে কি হবে? মানুষেরা আজ একশো সাতাত্তোর আটাত্তোর বছর ধরে বাস্তব সত্যের উপর তো কম কল্পনার রঙ চড়ায়নি। অবশ্য সব কিছুকেই কল্পনা বললে ভুল হবে গোঁড়ামি হবে। সুতরাং থাক।

মিরজা নজফের মৃত্যুর পর বাদশাহের দরবারের সর্বেসর্বা কে হবে এ নিয়ে বিরোধ বাধল অবশ্যম্ভাবীরূপে। মিরজা নজফের ধর্মপুত্র হিসেবে এল মহম্মদ সাকী—তার সঙ্গে অন্য দিক থেকে আফ্রিসিয়াব খাঁ নজফ কুলী খাঁ। থাক। সে অনেক কথা। বাদশাহের দরবারের কলহের সুযোগে চারিদিকে উঠল বহু জন বহু শক্তি: শিখ রোহিলা রাজপুত—যেন আগুন জ্বলে উঠল। বাদশাহ শাহ আলম বেগম সমরুর পল্টন নিয়ে নিজে বের হলেন। মাহাদজী সিন্ধিয়া দুর্বল হয়ে পড়ল। সুযোগ মিলল গোলাম কাদেরের! মাহাদজী সিন্ধিয়া শত্রুতা ছেড়ে সন্ধি করতে চাইলে। কিন্তু বাদশাহের হারেমের নাজির খোজা মনজুর আলি গোপনে বারণ করে লোক পাঠালে।—খবরদার, তোমাকে শিখদের সঙ্গে লড়াইয়ে ঠেলে দেবে। নিজে দিল্লীতে সর্বেসর্বা হয়ে বসে থাকবে। সিন্ধেকে হটতে হল। মনজুর আলি চক্রান্ত করে বাদশাহকে বললে—শাহান-শাহ, এবার নাজিবউদ্দৌলার নাতি গোলাম কাদেরকে ডেকে মীরবক্সী করুন। সে নওজোয়ান—পিতামহের মতই জঙ্গী আর তারই মত ইমানদার হয়ে উঠেছে। মুঘলাই বাদশাহী কাফের বর্গীর তাঁবেদারিতে থাকে এর থেকে বদনামী আর কি হবে? গোলাম কাদেরই একমাত্র বাঁচাতে পারে।

বাদশাহ ভুললেন। গোলাম কাদেরের কাছে পাঠালেন খেলাত।

মীরবক্সীর বাহালনামা আর পোশাক তার সঙ্গে ঘোড়া আর হাতিয়ার।

বাদশাহ শাহ আলমশাহের বিশ্বাসের পাত্র ছিল দুজন—এক নাজির খোজা মনজুর আলি আর ছিল বাদশাহের হারেমের রসদ যোগানদার মুদী রামরতন বানিয়া।

রামরতন বানিয়াও সায় পুরেছিল মনজুর আলির কথায়।

গোলাম কাদের দিল্লী এসে ঢুকল। মাহাদজী বর্গী ফৌজ নিয়ে তার আগেই সরে গেছে। গোলাম কাদের দিল্লী ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের আগুন জ্বলল। কালাশের ছিল না। কিন্তু পরভীন ছিল। সে বলে দিলে—বদলা নাও কাদের ভুলো না। ভুলো না ঘাউসগড় লুঠের কথা। ভুলো না মালকিনইজমানির সঙ্গে কি কথা হয়েছে। শা আলমকে নামিয়ে বিদরভক্তকে মসনদে বসাও। মালকিনইজমানির অনেক দৌলত। এবার লাখ কি আরও অনেক পাবে! বাদশা শা আলম ঘাউসগড়ের দৌলত গেড়ে রেখেছে—ঐ বুড়ো কঞ্জুসকে কবুল করাও।

হয়তো সে এক গ্লাস পুরা কালাশেরা কড়া আরক তাকে খাইয়েছিল। তার সঙ্গে কানে কানে ফিসফাস করে পরামর্শ দিয়েছিল খোজা মনজুর আলি—বাদশাহের অতি বিশ্বাসের পাত্র—লালকেল্লার হারেমের নাজির।

মালকিনইজমানির কাছে নিজে গিয়েছিল পরভীনবানু। মালকিনইজমানি পাকা কথা নিলেন দিলেন।

ইতিহাসে আছে গোলাম কাদের যে অত্যাচার করেছিল যেভাবে লালকেল্লা লুঠ করেছিল তেমন ভাবে লুঠ নাদিরশাহ আমেদশাহ আবদালীও করে নাই।

প্রথমেই দখল করেছিল সেই আটটা কামান যা বাদশাহ ঘাউসগড় থেকে এনে লালকেল্লার বুরুজে চড়িয়েছিলেন।

জনপ্রবাদ, কাদের কড়া আরকের নেশায় লাল চোখে দেখতে পেয়েছিল নবাব নাজিবউদ্দৌলাকে বাপ জবিতা খাঁকে। তারাও বলেছিল—বদলা লেও। বদলা।

শাহ আলমকে মসনদচ্যুত করে তাকে হাতে পায়ে বেঁধে দেহুড়ি-ই-সালাতিনএ পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখানেই মরেছিল ফররুখশের এখানেই মরেছিল জাহান্দারশাহ এখানেই মরেছে অন্ধ আহম্মদশাহ। বাদশারা বন্দী হলে এখানেই থাকে। বাদশার সঙ্গে সঙ্গে লালকেল্লার হারেম থেকে টেনে এনে পুরে দিয়েছিল বাদশাহের বেগমদের বাঁদীদের শাহজাদীদের শাহজাদাদের। আর লুঠ চলেছিল সারা হারেম জুড়ে।

কোথায় আছে দৌলত। কোথায় আছে ঘাউসগড় লুঠ করা আসবাব—সেইসব বর্তন সেইসব তাঁবু শামিয়ানা, বের কর টেনে। গোলাম কাদেরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাজিবউদ্দৌলার আত্মা। বের কর। টেনে বের কর।

খোঁড়ো মেজে। খুঁড়ে তছনছ করে দাও জয়পুরী সাদা পাথর ফিরিঙ্গীস্তানের দামী মার্বেল। খোঁড়ো খোঁজো।

তারপর গোলাম কাদের এসে দাঁড়িয়েছিল বাদশা শাহ আলমের সামনে। বলেছিল—কুরসি আন। ফুরসি আন। তামাকুল আন।

কুরসিতে বসে ফুরসির নল মুখে দিয়ে টানতে টানতে বাদশাহের গলা জড়িয়ে তাঁর মুখে ধোঁয়ার সঙ্গে থুতু দিতে দিতে বলেছিল—বলো—বাতাও কোথায় আছে দৌলত লুকনো? বলো!

তারপর বাদশাহকে বসিয়ে দিয়েছিল দিল্লীর শাওন ভাদোর

সুযের নীচে। বারণ করে দিয়েছিল—এক দানা খানা না। এক বুঁদ পানি না।

বাদশাহ বলেছিলেন—যা ছিল তা তোমরা খুঁড়ে বের করেছ। আর নেই। কোথা পাব।

কাদের বলেছিল—আছে। নিশ্চয় আছে। বল কোথায় আছে।

—নাই। থাকলে আমার পেটে আছে। আর কোথা থাকবে?

কাদের বলেছিল—তাহলে ওরে বুড়ো তোর পেট কেটেই দেখব আমি।

এসব কল্পনা নয়। ইতিহাসের সত্য।

দাঁড় করিয়ে রেখেছিল দিল্লীর শ্রাবণ মাসের রৌদ্রে। শুধু বাদশাহ নয়। তার সঙ্গে তার উনিশজন শাহজাদা তার বেগম শাহজাদাদের বেগম শাহজাদীদের বাঁদীদের। সকলকে।

কড়া হুকুম—এক দানা খানা না। এক বুঁদ পানি না। দিলে—।

তিনজন বান্দাকে ডেকে তাদের বুকে সোজা তলোয়ার বসিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কি হবে।

হুঁশিয়ার!

এক দিন নয়। দু দিন তিন দিন চার দিন।

এক দানা খানা না। এক বুঁদ পানি না।

বাদশাহের নাতি মল পাঁচজন। বাদশাহের দুই সৎমা আজিজুদ্দিন আলমগীরের দুই বেগম মরল পানি পানি রব করে। শা আলমের নিজের এক বেগম মরে গেল। সে মরে গেল ভয়ে। একুশ দিন ছিল গোলাম কাদেরের উজীরশাহী সিপাহসালারশাহী—তার মধ্যে বাদশাহের বাড়ির ছেলে মেয়ে বেগম মা সব মিলিয়ে একুশজন মরেছিল।

গোলাম কাদের তখন উন্মত্ত।

ফকীরসাহেব নামাজ সেরে এসে আবার শুরু করেছিলেন, বলেছিলেন—শোন বাবুজী। গোলাম কাদের তখন উন্মত্ত হবেই।

কালাশের এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে সে আরকখাওয়া মগজ সুর্মাপরা চোখে দেখতে পেত। সে বলত—লেও বদ্‌লা লেও।

বাবুজী, দুনিয়ায় শয়তানের জায়গীর তিন জায়গীর। যাকে তোমরা বল কাম ক্রোধ লোভ। ওর সঙ্গে আছে বাবু এই বদলা নেওয়ার প্রতিহিংসা।

বাবুজী, সেই প্রতিহিংসায় সে শেষ বাদশাহের বুকে চড়ে বসল; আর হুকুম করলে—ডেকে আন্ দরবারের যে তসবীর আঁকে তাকে। তার সামনে সে ছুরি দিয়ে বাদশাহের চোখ উপড়ে নিলে। আর ওই চিত্রকরকে বললে—এর ছবি আঁকো। নাম দিও প্রতিহিংসা। বদ্‌লা। ঘাউসগড়ের বদ্‌লা।

বাবুজী, তার পর লোভের কথা শোন বাবুজী।

মালকিনইজমানিকে হুকুম পাঠালে—দাও বারো লাখ টাকা—মসনদে বসাচ্ছি বিদরভক্তকে।

মালকিনইজমানি বললে—টাকা নেই। টাকা তুমি অনেক লাখ পেয়েছ লালকেল্লা লুঠে।

হা-হা করে হাসলে কাদের।

তারপর মালকিনইজমানিকে আর সাহেবাইমহলকে এনে কেল্লার উপর সব মানুষের সামনে বোরখা খুলে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—নিকালো রূপেয়া!

তারপর বাবুজী—মনজুর আলি।

মনজুর আলি বলেছিল—কাদের, আমি তোমার ধরমবাপ।

কাদের বলেছিল—এরে খোজা তু হারামজাদ! সাত লাখ রূপেয়া

তোকে দিতে হবে। তুই দে। কালাশেরের পাওনা। কালাশের বলছে। ওই সে দাঁড়িয়ে! নিকাল!

তারপর বাবুজী ওই পরভীন ঢুকেছিল দেহুড়ি-ই-সালাতিনে। চোখ তুলে নেওয়ার পর অন্ধ বাদশা তখন কাঁদছে বুক চাপড়ে; খোলা জায়গায় পড়ে আছে বাদশাহের হারেমের দুজনের মুর্দা। ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কবর দিতে মানা ছিল।

পরভীন হারেমে ঢুকে টেনে এনেছিল দুজন শাহজাদীকে।—চলো।

সুন্দরী অপূর্ব সুন্দরী তারা।

তাদের নিয়ে গেল সে রাত্রে গোলাম কাদেরের সামনে। গোলাম কাদের কড়া আরক খেয়ে আধানাঙ্গা হয়ে বসে আছে তাদের জন্য।

হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

এক নওজোওয়ানী পরভীনের সামনে দাঁড়াল। চমকে উঠল পরভীন। ভয়ে সে কেঁপে উঠল। এ কে?

এ যে সেই শঙ্করবাঈ।

শঙ্করবাঈ বললে—বদলা নিতে এসেছি।

বাবুজী, গোলাম কাদের তাকে দেখলে না। গোলাম কাদের দেখলে মনিয়ার সিংকে। চান্দ সিংয়েব নাতি—শঙ্করের দাদাজী। মনিয়ার সিং। মনিয়ার সিং গোলাম কাদেরের জবরদস্ত মনসবদার সেনাপতি।

তাকে ডেকে এনেছিল ওই শঙ্করের আত্মা। বাবুজী, মরেও সে মহব্বতি ভুলতে পারেনি। পবিত্র তার আত্মা। হজরত রহিমশাহের মুরিদা ছিল সে, সে নটী গন্ধর্বী হলেও পবিত্র। সে এসেছে তার পিয়ার নবাবজাদাকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে! মনিয়ারকে সেই ডেকে এনেছে।

মনিয়ার সিংকেই দেখলে নবাবজাদা।

মনিয়ার বললে—নবাবজাদা, এ গুনাহ্ করো না !

নবাবজাদা হয়তো মানতে চাইতো না। কিন্তু পরভীনের ভয়ার্ত চিৎকারে সে চমকে উঠল। পরভীন ছুটল ভয়ে ছুটল।—নবাবজাদা সেই শঙ্করবাঈ—নবাবজাদা মুঝে বাচাও !

কিন্তু নবাবজাদার জন্যে অপেক্ষা করলে না। সে ছুটল। এক উন্মাদিনী একটা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

বাবুজী, এতক্ষণে কাদের দেখতে পেলে শঙ্করবাঈকে। কাদেরও চমকে উঠল।

—শঙ্কর !

শঙ্করের আত্মা বললে—হ্যাঁ।

বাবুজী, শঙ্করের আত্মাকে কাঁদতে দেখেছিল গোলাম কাদের। মহাগুনাহ সেদিন সে আর করেনি। শাহজাদীদের ছেড়ে দিয়েছিল। আর শঙ্করের আত্মা তাকে বলেছিল—নবাবজাদা, তুমি পালাও। তুমি মরবে। কালাশের তোমার কাছে তার পাওনা আদায় করবে। তোমার চোখ নেবে কান নাক নেবে আঙুল নেবে। শেষ তোমার গর্দান যাবে। কালাশেরের সেই কুকুর সেই কালো কুকুর—চোখের চারিপাশে সাদা দাগ—সে এসে তোমার লহু চেটে চেটে খাবে। তুমি পালাও। পালাও। পালিয়ে গিয়ে হজরত রহিমশার পায়ে গিয়ে পড় ফকীরী নাও—তুমি পালাও।

নবাবজাদা কাদের পালিয়েছিল বাবুজী। কিন্তু কোথায় পালাবে ? একদিকে বাদশাহের সাহায্যে তখন আবার বর্গীরা এগিয়ে এসেছে—ওদিকে তার রোহিলা সিপাহীরা তাকে ধরে রেখেছে।

দিল্লী থেকে পালাল তার পরের দিন।

পালাল সিপাহীদের সঙ্গে। পরভীনবানুকে খুঁজে পায়নি বাবুজী। লালকেল্লার সিপাহীরা তাকে আটকাতে পারেনি—তারাও

ভয় পেয়েছিল। সে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল লালকেল্লার ফটক দিয়ে।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, বলেছি তো নবাবজাদা কাদেরকে কালাশেরের দেনা শোধ করতে হয়েছিল। কালাশেরই তাকে ঘাউসগড়ের বদলা নিতে বল যুগিয়েছিল, সেই বলেছিল তাকে বাদশার চোখ তুলে নাও, ওদের না খাইয়ে মার বেইজ্জতি কর। শয়তান তো ওতেই খুশী বাবুজী। এর জন্যে গোলাম কাদেরকেও দিতে হল তাকে নিজের চোখ কান নাক আঙুল গর্দান। আর তার রক্ত।

নবাবজাদাকে বর্গীরা তাড়িয়ে নিয়ে শেষ তাকে গেরেপ্তার করলে সেই বামনওলীতে। সেই ভাঙা অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের চত্বর থেকে। বাদশাহী সিপাহীর ভয়ে পালাচ্ছিল গোলাম কাদের। আঁধিয়ারা রাত। পথে নবাবজাদার ঘোড়া সঙ্গীদের সঙ্গ ছেড়ে পাগলা হয়ে ছুটেছিল। মাঝখানে একটা গর্তের মধ্যে ঘোড়াটার পা ঢুকে পা ভেঙে পড়ে গেল। নবাবজাদা পড়ল ছিটকে। পায়ে চোট লাগল। কিছুক্ষণ পর উঠে চলতে লাগল উত্তর দিক ঠাওর করে। উত্তর দিকে ঘাউসগড়। কিন্তু নসীবের খেল। সে এসে উঠল বামনওলীতে। সেই মন্দিরের ধারে সেখানে ছিল কে জান? ছিল সেই বুড়ো অন্ধা মহারাজ। নসীবের খেল দেখো। নবাবজাদা ভাঙা মন্দির ভাঙা গ্রাম দেখে বামনওলীকে ঠিক চিনতে পারেনি। আর এমনি মগজের গড়বড় হয়েছিল যে অন্ধা পুরোহিতকেও চিনতে পারেনি।

তাকেই সে বললে—বুড়ো, একটা ঘোড়া আমাকে যোগাড় করে দিতে পার? তোমাকে অনেক মোহর বকশিস দেব।

নবাবজাদা চোখ নিয়েও চিনতে পারেনি। কিন্তু অন্ধা মহারাজ তার গলা শুনে তাকে চিনলে। এক লহমায় চিনলে।

চিনবেই বাবুসাহেব—'কিঁউ কি' (কারণ) নবাবজাদা ঠিক সেই কথাগুলিই বলেছিল—যা সে বলেছিল সেই প্রথম দিন যেদিন সে দেখেছিল শঙ্করকে।

নবাবজাদাকে বসিয়ে অন্ধা মহারাজ লোক পাঠিয়েছিল কাছেরই একটা বর্গী ছাউনিতে।—গোলাম কাদেরকে আটকে রেখেছি। জলদি এসো।

এল তারা—তারা তাকে ধরলে। তখন নবাবজাদা বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিল।

তারপর বাদশাহ চেয়ে পাঠালে—বদ্‌লা পাঠাও। সিন্ধিয়া তুমি বদ্‌লা পাঠাও।

দিতে হল বদলা। চোখের জন্য চোখ। তার সুদ নাক কান আঙুল। আর কালাশেরের দেনার জন্যে গর্দান। তারপর লাশটা বাবুজী পায়ে বেঁধে গাছের উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল আগ্রা থেকে মথুরা হয়ে দিল্লী যাবার পথের ধারে। বাদশাহের কাছে ঝাঁপিতে করে গেল নাক কান আঙুল চোখ। নাক কান চোখ না থাকা সেই মুণ্ডুটার জন্যে সেদিন সিন্ধিয়ার তাঁবুর বাইরে রহিমশা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গর্দান যখন গেল ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা তখন হজরত এসে চাইলেন সেই মুণ্ডুটা। লাশটা টাঙানো রইল গাছে।

শঙ্করের আত্মা হজরতকে বলেছিল ওর ওই মুণ্ডুটা যেন আপনি আমার কবরের মধ্যে রেখে দেবেন। আমার কঙ্কালের বুকে। শয়তান আমার বুক থেকে কাড়তে পারবে না। তাই দিয়েছিলেন হজরত রহিমশাহ।

আমি মিথ্যা বলি নাই বাবুজী। খয়রুদ্দিন তবারিখ লিখে রেখে গেছে। পড়ে দেখো। লাশটা নিয়ে গেছে কালাশেরের শয়তান।

খয়রুদ্দিন লিখেছে---গাছে টাঙানো হল লাশ। রক্ত ঝরতে লাগল। সকলে দাঁড়িয়ে দেখছে এমন সময় কোথা থেকে এল এক ভীষণ কালো ভয়ংকর কুকুর। চোখ দুটো তার কটাসে। আর চোখের চারিপাশে আশ্চর্য সাদা ঘের। সে এসে ডেকে উঠল ভারী গলায়। যেন সাবধান করে দিলে সকলকে। তারপর ওই ঝরা রক্ত সে চেটে চেটে খেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জাতে লাগল। মানুষদের তাড়া করে ছুটল।

দল বেঁধে মানুষেরা তাড়াতে এল। কিন্তু তাকে তাড়ানো গেল না। দিনভর সে রইল জিভ পেতে। রাত্রেও। ভোরবেলাতেও। তারপর একসময় দেখলে কুকুরও নেই লাশও নেই।

হজরত রহিমশা বলতেন—সেটা নিয়ে গেছে কালাশের। কুকুরটা তার পিছনে পিছনে গেছে। সে খুঁজে বেড়ায় গোলাম কাদেরের মুণ্ডুটা। সেটা কবর দেওয়া আছে নটীর বেটী শঙ্করবাঈয়ের কবরে তার বুকের উপর।

হজরত রহিমশা তার উপর দরগা বানিয়ে আস্তানা করেছিলেন। আমরা যারা হজরত রহিমশাহের মুরিদেরমুরিদ আমাদের উপর হুকুম আছে এখানে আসতে হবে চেরাগ জ্বালাতে হবে। খোদার নাম নিতে হবে। আর বাবুজী ভজন গাইতে হবে।

বিশেষ করে হিন্দুস্তানে যখন দেখবে জীবনে তুফান উঠবে তখন খুব হুঁশিয়ার। দেখো কালাশেরের মত পায়ের চেহারা নিয়ে শয়তান ঘুরছে। হয়তো সব সময় পা এমন নাও হতে পারে। তখন সে এসে ঘুরে বেড়াবে সারা হিন্দুস্তানময়। শয়তানের জিন্দগী কায়েম করবার জন্য। তখন সে এই কবর খুঁজে কাদেরের মুণ্ডুটা ছিনিয়ে নিতে চাইবে। যদি পারে তবে সেই লাশটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে। সে বেঁচে উঠবে। এবার আমার ভয় হয়েছিল বাবুজী।

কিন্তু খুদা মেহেরবান। না। তা হবে না। গন্ধর্বীর বেটীর হাতের বন্ধন বহুৎ জোর। সে আঁকড়ে ধরে আছে। ছাড়বে না।

আরও এক আশ্চর্যের কথা আছে বাবুজী। এক পাগলী ওই দরগার কাছে থাকবেই। একজন মরে আর একজন আসে। প্রথম যে এসেছিল হজরত রহিমশা তাকে দয়া করে রুটি দিতেন। সে কাঁদত। এখনও আমাদের পাগলী থাকলে রুটি দিতে হয়।

* * *

আমি ফকীরকে শ্রদ্ধার সালামৎ জানিয়ে ফিরলাম আগ্রায়। মনের মধ্যে ঘুরছিল খয়রুদ্দিনের লেখা থেকে উদ্ধৃত ইতিহাস।

Khairuddin tells us a gruesome tale of how, when his headless trunk was hung upside down from a tree a black dog with white rings around its eyes sat below it and lapped up the blood dripping from the neck··· and after two days both corpse and dog disappeared never to be seen again.

According to popular belief his infernal Master to whom he had sold his soul···গোলাম কাদেরের আত্মাকে কিনেছিল কালাশের সাক্ষাৎ শয়তান। সে শুধু তার মুণ্ডহীন ধড়টা পেয়েছে।

থাক শয়তানের কথা থাক।

থাক নবাবজাদা গোলাম কাদেরেরও কথা থাক।

নটীর বেটী শক্করবাঈ। ভারী মিষ্টি নাম। শক্কর মানেই চিনি। শক্করবাঈ ভারী মিষ্টি নাম।

হজরত রহিমশাহকে সেলাম। তিনি বলে গেছেন এ কাহিনী তাঁর মুরিদ মুরিদাদের।

—শেষ—